বিষের ঝড়

বিষের ঝাড়

শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

দাম বারো আনা

আমার মা'কে দিলাম।

"অর্দ্ধ নিশিথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?"

Photo By B. DOS.

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষের ঝড়

—৺—
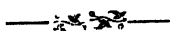
এক

আমি মাতাল—উন্মত্ত মাতাল! মদ্ আমার এখন প্রাণ—আমার সর্ব্বস্ব।

আমি মাতাল, তাই সমাজ আমার উপর বিমুখ—মানুষ অসন্তুষ্ট—বন্ধুবর্গ বিরক্ত! আমাকে দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে। কেন?

মানুষের ত মানুষকে ঘৃণা করিতে নাই! পাপকে ঘৃণা কর—পাপীকে ঘৃণা ক'র না। এই নীতি-বাক্য যদি সত্য হয়, আমার কাহিনীটুকু শোনাবারও একটা দাবী আছে। শুনে, তিরস্কার পুরস্কার যা' ইচ্ছা দাও, আমি মাথায় তুলে নেব।

বিষের ঝড়

বাপ-মা'র আমি এক ছেলে। খুব ধনী না হলেও নিতান্ত গরীব আমরা ছিলাম না। এক ছেলে—সুতরাং সকলেই আমাকে ভালবাসতো—যা' কিছু আব্দার আমি করতাম্ সবই পূরণ হ'ত। প্রবেশিকা পাশ করে একটা স্কলারশিপ পেলাম। মা'র হলো সবচেয়ে বেশী আহ্লাদ। কেমন করে আমাকে আদর করবেন—কেমন করে কতখানি স্নেহ দিলে আমার উপযুক্ত পুরস্কার হবে কিছুতেই মা ঠিক করতে পারলেন না। শেষে তাঁর সমস্ত আনন্দের আশিস্ এল, বিগলিত অশ্রু-সম্ভারে!

এই সময়ে আমার বিয়ে দেবার জন্য সকলে উত্তিষ্ঠ হয়ে উঠ্লেন। সকলেরই যুক্তি, যেহেতু আমি বাপ-মার একছেলে আমার এখন বিয়ে দেওয়া খুবই উচিত! প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কেবল আমার পিতা কিন্তু শেষকালে হারটা হ'ল তাঁরই! বিয়ে হ'ল মস্ত ধনী জমিদারের একমাত্র দশ বছরের বালিকা-কন্যা মলিনার সহিত। বিয়ের কিছুদিন পূর্ব্বে মলিনা বেথুন কলেজে ভর্ত্তী হয়েছিল। বিয়ের পর আমার শ্বশুর পিতার অনুমতি-গ্রহণ না করেই মলিনাকে সেই বেথুন কলেজেই পড়াতে লাগলেন। যদিও বাবার এইরূপে শিক্ষা দিবার কোনই আপত্তি ছিল না তবুও কেন যে তাঁহার বিনা-অনুমতিতে এইরূপ কাজ করা হ'ল এই তুচ্ছ অভিমান নিয়ে—বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হলো এবং এই সামান্য ব্যাপারটাই ভীষণ হয়ে উঠ্লো। শ্বশুরের কানে যখন এই কথা পৌঁছায় তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে জমিদার মণিলাল কখনও কাহারও অনুমতি নিয়ে

কোনও কাজ করেন নাই বা ভবিষ্যতে কখনও করবেন না! ব্যস্—তারপরেই সব সম্বন্ধ, সব সম্পর্ক ঘুচে গেল! মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল—যেন দু'পক্ষই পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঠিক এর পর হতেই জীবনের পরীক্ষা একে একে আরম্ভ হ'ল। আই-এস্ সি পাশ করে বিলাত যাবার জন্য খুব জেদ করি। বাবার এতে মত ছিল কিন্তু মা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না! আমি তাঁর মাত্র ঐ এক সন্তান; আমি চলে গেলে কার মুখ চেয়ে—কাকে বুকে চেপে ধরে তিনি বেঁচে থাক-বেন! আমি বড় হলেও তাঁর কাছে তো চিরদিনই ছেলেমানুষ! অজানা দেশে একলা আমি কি করে থাকবো! যতই মাকে বুঝাই, ততই তাঁর দু'চক্ষু বাষ্পাকুল হয়ে স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন মা আমাকে ডেকে বললেন "বিকাশ—তুই যা'—আমি তোকে অনুমতি দিচ্ছি; কিন্তু বাবা তোকে মানুষ হয়ে ফিরতে হবে। পারবি তো?"

মার মুখে এই কথা শুনে আমি তো আনন্দে আত্মহারা! নিজেরই সুখস্বপ্নে নিজেই বিভোর! ক্ষণিকের তরেও বুঝি নাই যে আমাকে মানুষ করবার আশায় আমার জননী কতখানি ত্যাগ-স্বীকার করতে, কতখানি যন্ত্রনার শেল বুকে চাপা দিতে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন!

বিলাত গিয়ে ডাক্তার হ'ব। আগে এই 'বিলাত' নামে কত আশা—কত আনন্দ হ'ত! কিন্তু এইবার যখন সত্যই বিলাত

যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো চারধার হতে একটা অজানা আতঙ্ক এসে আমাকে ঘিরে ফেল্‌লে। বাড়ীর জন্তে মন কেমন করতে লাগলো—বাবা, মা—যাদের কথা কোনও দিনই ভাবি নাই হঠাৎ তাঁদের চিন্তা মন্‌টাকে বিশেষভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ব্যথিত হৃদয় আর এক জনের কাছে ছুটে যেতো। বিয়ের পর এক বৎসরের মধ্যেই তো সব সম্বন্ধ ঘুচে গেছে কিন্তু আশ্চর্য্য যে এই ক'দিনের মধ্যে ঐ অতটুকু মেয়ে কেমন করে আমার বুকের মাঝে তার প্রাপ্যস্থানটুকু অধিকার করে নিয়েছিল! অনাবিল কোমল কলিকা, কোমল প্রাণ—বিচ্ছেদ, বিরহ ব্যথা যেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই পুষ্পটী কোরকেই নষ্ট করিতে তোমার—কোনও কষ্ট হইল না, হে ভগবান! বিলাত যাবার আগের দিন মলিনাকে একবার দেখে যেতে বড় ইচ্ছা হলো। দেখ্‌তে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলাম কিন্তু যাব কি করে! নিঝুম তখন নিশীথ রাত, আকাশজোড়া নিবিড় অন্ধকার, চোরের মত একলা ফুটপাতের ঘাসের উপর দিয়ে পা টিপে চললাম। ফটকে চাবী বন্ধ ছিল কিন্তু ফটকের পাশে যে ছোট্ট রেলিং ছিল সেইটা টপ্‌কে বাগানে নেমে পড়লাম। বাগানের পশ্চিম ধারের ঘরের কাছে গিয়ে দেখি জানালা সব খোলা; গোলাপী সিল্কের পর্দ্দাগুলা হাওয়ায় থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছিল। জানালার উপরে উঠে দেখলাম, খাটের উপর সে গভীর নিদ্রামগ্না; সে যেন দৈত্যপুরীর রূপসীবালা শিয়রে সোনার কাঠি—প্রান্তে রূপার কাঠি। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে নেমে বিছানার

কাছে গেলাম। সঙ্গে এনেছিলাম একটী সোণার লকেট; এই লকেটের উপরে তারই মুখ খোদিত ছিল। আর ভিতরে ছিল আমার একটী ফটো আর একটী কাগজের টুকরাতে কয়টী কথা—

"মলিনা—আমি পালাই! আর দেখা হবে কিনা জানি না।"

তোমারই—

বিকাশ।"

টেবিলের উপর লকেটটী রেখে ক্ষণিকের তরে তার মুখপানে চেয়ে রইলাম। তার পর ফিরে এলাম; কিন্তু জানি না কেন ফিরে আসবার আগে আমার ভিতরে কি যেন হচ্ছিল! হয়তো অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছিল!

দুই

ঊষার অরুণ আলোকে যখন কাকলী-কূজন সারা গগনে ছড়িয়ে পড়লো মনে হ'ল এরাও যেন আমার বিদায়-সঙ্গীত গাইছে কেননা আমি যে আজ বিলাত যাব! যে মার মুখে এতদিন বিষাদ মূর্ত্তি আঁকা ছিল আজ দেখি তার পরিবর্ত্তে একটা স্বর্গীয় আলো ফুটে উঠেছে। সে বিষণ্ণতা আর নাই—অলক্ষ্যে রোদনের সে অশ্রুরেখাও লুপ্ত!

সন্তান!—সে যে মা'র নয়নের মণি—জগতের সবচেয়ে আদরের জিনিষ! মাতৃত্ব নারীজন্মের সার্থকতা। সন্তানের বাড়া সে আর কিছু চায় না—কিছু প্রত্যাশা করে না। মা যখন সন্তানকে বুকে ধরে আদর করেন সে স্নেহর মত পবিত্র স্নেহ আর কোথাও নাই—সেই নিষ্কাম ভালবাসাও স্বর্গীয় দৃশ্যের তুলনা আর কোথাও নেই! সেই স্নেহময়ী মার বুক হ'তে তাঁর সোহাগনিধিকে কেউ যদি কেড়ে নেয় তিনি যেমন উন্মাদিনীর মত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন—মণিহারা ফণীর মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, ফিরে পেতে তাঁর হারানো মাণিক, ঠিক তেমনি ভাবে মা আমার অস্থির হয়ে একবার ঘরের ভিতরে—একবার বাহিরে, একবার বা আমার কাছে আসতে লাগলেন। আমাকে বিদায় দেবার জন্যেই তিনিই যেন আজ সবচেয়ে বেশী উদযোগী।

যথা সময়ে যাত্রার শুভ সময় এল। মা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। আমিও সে কান্নায় যোগ দিলাম — পরিজনবর্গও যোগদান করিলেন; কান্নার একটা স্রোত বহিয়া গেল।সেই কান্নার মধ্যে চোখ্ মুছতে মুছতে আমি রওনা হলাম। প্রথম প্রথম কয়দিন কিছু ভাল লাগ্‌তো না। একে তো বাড়ীর জন্যে কষ্ট হতো উপরন্তু সঙ্গীহীন।

একদিন জাহাজে পায়চারী করতে করতে আর একধারে গিয়ে দেখি একটী বাঙ্গালী ছেলে বসে বই পড়ছে। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম তার অরুণ চাটার্জ্জী; তিনি বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়্‌তে যাচ্ছেন। ক্রমেই তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। জাহাজে অতিবাহনের কালটুকু আমরা দুজনে সবসময়েই এক সঙ্গে থাকতাম।

জাহাজে দিনগুলা বেশ আমোদে কেটে গেল। বিলাতে এসে পৌছুলাম। এইবার অরুণের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো; এর মধ্যে মাঝে মাঝে অরুণের সঙ্গে দেখা হতো। পরস্পর তখন কেউ কাহাকে ছাড়্‌তে পারতুম্ না। দেখা হলে কত প্রাণের কথাই না হ'ত! এই তো ক'দিনের আলাপ কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা চমৎকার মনের মিল ও গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল!

কয়েক বৎসর পরে, অরুণ পাশ করে দেশে ফিরে গেল, পড়ে রইলাম আমি! আরও কয়েক মাস কাটিয়ে ডাক্তার হয়ে আমি

দেশে ফিরে এলাম। বাড়ীর সকলে আমাকে দেখে অবাক্! আমার চেহারা নাকি সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে—'বিকাশ' বলে চেনবার মোটেই উপায় নাই! শুধু চেহারা নয় কণ্ঠ-স্বরেও নাকি আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পয়সার জন্যে বছর চারেক নানা দেশ ঘুরলাম। ভাগ্যলক্ষ্মী এই জিনিষটা আমাকে যথেষ্ট দান করেছিলেন; কিন্তু পয়সাই কি সব! পৃথিবীতে কি আর কিছু কাম্য নাই? শান্তি তো কই কখনও পেলাম না!

দেশে ফিরে এসে অরুণকে অনেক খুঁজেছিলাম কিন্তু কোথাও তাহার সংবাদ পাই নাই। শেষে খবর পেলাম যে তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু শুনে ভারী ইচ্ছে হলো তাকে একবার দেখতে। সে কোথায় আছে কেউ ত তা জানে না! সুতরাং নিরুপায় হলুম্।

হঠাৎ এক বড়লোকের কাছে তাঁর গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হলুম। গৃহ-কর্ত্তা অসুস্থ, তাঁর সঙ্গে ওয়ালটেয়ারে চেঞ্জে যেতে হবে। দেশ-ভ্রমণের সহিত মোটা মাহিনার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। যোগেশবাবুর সহিত তাঁর স্ত্রী, কন্যা গীতা এবং আমি যাত্রা করিলাম।

ওয়ালটারে পৌছিলাম; রোজই যোগেশবাবুর সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াতাম। কোনও দিন, গীতাও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতো। তার সঙ্গে পরিচয়ে জানলাম আধুনিক শিক্ষা সে সবই পেয়েছে। তার মত এত আমুদে—এত খোলা মন, খোলা

প্রাণ মেয়ে আমি তো কখনও দেখি নাই! তার মুখে সরল শিশুর হাসি। যোগেশবাবুর মুখে শুনেছিলাম, গীতা রোজ তাঁকে রাত্রে গান শোনায়। ভারী ইচ্ছে হতো গীতার গান শুনতে কিন্তু এক দিনও সুযোগ ঘটেনি।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরছি এমন সময় যোগেশবাবু বললেন "ডাক্তার চল আজ এক সঙ্গে চা খাওয়া যাক্!" মৌনং সম্মতি জানিয়ে তাঁর সহিত তাঁর বাড়ীতে এলাম। চা খাওয়া শেষ হলে যোগেশবাবু বল্লেন "গীতা ডাক্তার বাবুকে তোমার গান শোনাতে হবে– কেমন? যাও ডাক্তার, ঐ খাতাটা দেখে বলে দাও কোন গানটা গাইবে!

আমি তো মহা মুস্কিলে পড়লাম; এ রকম জানলে কি কখনও চা খেতে আসি! যা'হোক কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। যোগেশবাবু বলে উঠলেন "বসে রইলে কেন? যাও— যে গানটা তোমার শুনতে ইচ্ছে হয় সেইটে বল!"

ধীরে ধীরে উঠে অরগানের কাছে গেলাম যেখানে গীতা বসেছিল। গীতা আমার হাতে একটী খাতা দিতে এলো কিন্তু তার আগেই আমি বললাম "আমি কি বলবো? আপনার যেটা ইচ্ছে হয় সেইটে গান।"

বোধ করি গীতা আমার সঙ্কোচ বুঝতে পেরেছিল। তাই হাস্‌তে হাস্‌তে আমার প্যানে চেয়ে বললে "আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন – আমি গাইছি।" আমি পাশের চেয়ারটীতে বসে পড়লাম, গীতা গাইছিল—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু—তোমার পানে,
তোমার পানে,
তোমার পানে।
"যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু—তোমার কানে,
তোমার কানে,
তোমার কানে।
হে বন্ধু মোর হে অন্তর তর
এ জীবনে মোর যা কিছু সুন্দর
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু—তোমার গানে,
তোমার গানে,
তোমার গানে।

গান থেমে গেল কিন্তু মনে হ'ল যেন তখনও আমি গান শুন্‌ছি। গানের রেশ পর্দ্দায় পর্দ্দায় আমায় কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করছিল। এত মিষ্ট গলা? উৎসুক নয়নে যেমন ভাবে আমি গীতার পানে চেয়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবেই আমি চেয়ে রইলাম। গীতা তার স্বাভাবিক সরলতায় হাস্‌তে হাস্‌তে বললে "আচ্ছা বলুন তো ডাক্তারবাবু—গানটা কেমন গাওয়া হলো? ভাল—না খারাপ—না, 'মন্দ নয়'!" গীতার কথা শুনে যোগেশবাবু বললেন "থাম বেটী—খুব ভাল হয়েছে!" পিতার কথায় সে বললে "না বাবা—

আপনি একটু থামুন! ডাক্তারবাবু বলবেন কেমন হয়েছে!" পরে আমার পানে চেয়ে বল্‌লে "কই বলুন?" আমি হেসে বললাম "চমৎকার হয়েছে!"

গর্ব্বের হাসি মুখে মেখে গীতা বললে "বাবা আপনি না বলেন যে আমার কোন গানটাই ভাল হয় না?" যোগেশবাবু হাসতে হাসতে সস্নেহে গীতার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

এমনি ভাবে প্রায় প্রত্যহই গীতার গান শুন্‌তে যেতাম। নীরস দিনগুলো এমনি আমোদে কাটতো।

সেদিন যোগেশবাবু বেড়াতে বাহির হলেন না। একলা কিছুতেই সময় কাটে না দেখে আমার সঙ্গের সাথী বেহালাটিকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে গেলাম। সবেমাত্র তখন আঁধার হয়ে আসছে। 'ফ্লোটীং টুমের' নীচে এসে বেহালা বাজাতে লাগলাম। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম তা জানি না; খানিক পরে ফিরে দেখি, গীতা পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। চোখোচখি হতেই গীতা হেসে বল্‌লে "বাঃ! ডাক্তারবাবু, আপনি এমন সুন্দর বেহালা বাজাতে পারেন, আমাদের তো বলেন নি!"

"হাঁ ঠিক বাজিয়ে ধরেছেন বটে! আপনি হয়তো ভাল বেহালা কখন শোনেন নি, তাই আমার বাজনা ভাল লেগেছে! রাস্তায় যারা বেহালা বাজিয়ে 'হরিনাম' করে বেড়ায় তারাও আমার চেয়ে ভাল বাজায়!"

গীতা হেসে বল্‌লে "ইস্ তা বইকি!—ডাক্তারবাবু আমাকে এই বেহালা বাজান শিখিয়ে দিতে হবে; কেমন দেবেন তো?"

"তা দেবো—কিন্তু শিখে যেন শেষে মাষ্টারের নিন্দা করবেন না! কেমন রাজী?" বলিয়া গীতার মুখপানে চাহিলাম।

উত্তরে গীতা বলিল "হাঁ রাজী; তবে কাল থেকেই শিখবো।"

গীতা বেহালা শিখতে লাগল। ছড়ী প্রথমে কিছুতেই টানতে পারে না—যদি বা পারে তখন আবার আঙ্গুল ঠিক থাকে না। খানিক চেষ্টা করে যখন দেখতো কিছুতেই পারছে না অমনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠতো "নাঃ আমার দ্বারা এ হ'বে না। বরং আপনি বাজান আমি শুনি।" আমি বাজাইতে থাকিলে সে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে বাজনা শুনতো। ভারি লজ্জা হতো, গীতা যখন এই রকম করে দাঁড়াত। বাজাতে বাজাতে যখন মুখ সরাতে যেতুম অমনি কতবার গীতার গালে আমার গাল ঠোকাঠুকি হয়ে যেতো। অমনি গীতা হাসতে হাসতে বলে উঠতো "আপনার বাজনা শুনতে শুনতে যে আমার দাঁতগুলি সব ভেঙ্গে গেল!" পরক্ষণেই লজ্জিত ভাবে গীতার দিকে চেয়ে দেখি তার মুখখানি আবীরের মত লাল হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—"খুব লেগেছে বোধ হয়?"

"না--কিছু হয় নি" বলে সে খানিক পরে চলে গেল। এই রকম ঘটনা প্রায় রোজই হতো!

অনেক দিন বাদে মা'র কাছ হতে সেদিন একটা চিঠি পেলুম। মা আমার কত অনুযোগ করেছেন। কেন আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিসের দুঃখ আমার? আমি তো

নিজের দেশে ডাক্তারী করতে পারতাম। তাহ'লে তিনি তো অন্ততঃ দুবেলা আমাকে চোখে দেখতে পেতেন। আমি বড় হয়েছি বলে কি আমার উপর তাঁর এখন কোনও অধিকার নেই! আমাকে কি তিনি কোনও শাসন করতে পারেন না—কোনও আজ্ঞা করতে পারেন না? আরও এই ভাবের কত কথা লিখেছেন। শেষে লিখেছেন যেন পূজার সময় আমি এবার তাঁর কাছে থাকি। তাঁর পত্রে এটা অনুরোধ-অনুযোগের মত দেখাইলেও আমার নিকট ইহা মাতৃ-আজ্ঞা!

কতদিন পরে আবার মা'র কথা মনে এলো! কি স্বার্থপর এই সন্তান! ছেলেবেলা হতে আরম্ভ করে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত নিজের কাজের সময় আব্দার করে মার কাছে ছুটে যায়—যখন যা চায় ঠিক তাই পায় কিন্তু এই স্নেহের পারবর্ত্তে কি দেয়! নিজের জিনিষটুকু ষোলআনা বুঝে নিয়ে তাঁকে উপেক্ষা করে—তাঁকে যন্ত্রণা দেয়! যে মাকে এতটুকু যত্ন করলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন—ঐ সামান্য যত্নটিকে দুর্ল্লভ মাণিক মনে করে বুকে আঁকড়ে ধরেন—যাঁর পুত্রস্নেহে অন্ধ-আঁখি ঐ যত্নটুকু দেখে পুলকে কাঁদিতে থাকে—তাঁকে কই আমরা তো কখনও ঐ সামান্য জিনিষটুকু দিয়েও কৃতার্থ করতে পারি না!

চিঠিখানা পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল এমন সময় গীতা পছন হতে এসে বললে—"কার চিঠি ডাক্তারবাবু?"

বলিলাম—"মা'র"।

গীতা সামনে এসে বললে—"কি লিখেছেন আপনার মা?"

আমি হেসে বললাম—"বাঃ আমি তা বল্‌বো কেন? পরের চিঠি কি শুনতে আছে?"

গীতা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমরা আপনার সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করি—আপনাকে 'পর' মনে করি—তাই বুঝি আপনি আমাদের 'পর' ভাবেন?"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—"সেকি! আমি তো কখনও আপনাদের পর মনে করি না!"

গীতা—"বেশ সরল কথাই বলেছেন এতে কোনও লজ্জা নেই! তবে আমিও এবার থেকে আপনার সঙ্গে সেইভাবে কথা বলব!"

আমি—"তাহ'লে সত্যই কি আপনি মনে করলেন আমি আপনাদের 'পর' বোধ করি?"

গীতা—"তা বিশ্বাস করলাম বই কি!"

আমি মৃদু হেসে বললাম—"ঠাট্টাও কি আপনি বোঝেন না!"

গীতা—"বুঝি; কিন্তু ঠাট্টা করার একটা সময় আছে—একটা তার আলাদা ভাব-ভাষা আছে। কখন কখন ঠাট্টাও সত্যি হয়।"

আমি—"যদি বলি যে আমি যা বলেছি সেটা মিথ্যা কথা! আমি আপনাদের পর ভাবি না! কেমন তাহ'লে বিশ্বাস কর্‌বেন তো?"

গীতা—"না"—বলিয়া বাহিরে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল!

নির্ব্বাক হয়ে ভাবতে লাগলাম; কি একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

গীতা তা হলে আমাকে বিশ্বাস করে না! সত্যই তো সে 'না' বলে গেল। চিঠিখানি ড্রয়ারের ভিতর রেখে বাহিরে যাবার

উদ্‌যোগ করছি এমন সময় গীতা আমার সামনে এসে নতমুখে বলিল —"ডাক্তারবাবু আমি আপনাকে বিশ্বাস করি! মিথ্যা কথা বলেছি; আমাকে ক্ষমা করুন।"

আমি কিছু বলবার আগেই সে আবার ঘর হতে চলে গেল।

নারীকে কখনও বুঝতে পারিনি—বোঝবার চেষ্টাও করি নি! মনে হয় সৃষ্টিগুরু তাদের জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এক রহস্যের রঙীন্-ওড়্নার আবরণে! তাদের দিকে যখন চাই, প্রতিবারেই তাদের নূতন রূপে—নূতন রঙে—নূতন ছন্দে দেখি! কখনও তারা চঞ্চলা সরলা কিশোরীর মত প্রথম প্রেমের পরশে, লাজ-বিরক্তি-মাখা, কাজল ঘেরা তীক্ষ্ণ স্নিগ্ধ চোখে কল্পলতা তরুর মত হেসে দুলে চলে যায়; কখনও বিরহিণী তরুণীর মত তাদের অশ্রুজলে ডুবে যাওয়া চোখের মণি প্রভাতের শুকতারার মত স্থির আকুল নয়নে চেয়ে থাকে স্মৃতিস্বপ্ন বিজড়িত অতীতের উজল্ দিনগুলার পানে; কখনও উন্মাদিনীর বেশে প্রলয় শঙ্খ শুনে ছুটে আসা রুদ্রদেবের রথের মত বেরিয়ে পড়ে, বিষ মেশানো প্রেমের পিয়ালা চোখের সাম্‌নে ধরে আলেয়ার মত কাছে দেখা দিয়ে ধীরে ধীরে তারা দূরে সরে যায়; আবার কখনও রূপময়ী প্রেমময়ীর মূর্ত্তিতে, কত নিঝুম নিশীথ রাতে নদীর কল-কলে, সবুজ বনের মর্ম্মরে, বকুল তলার ঝিল্লীরবে, নিজের রূপ পুড়িয়ে ধূপ জেলে— স্মৃতি দিয়ে সলিতা গড়ে অশ্রুজলের তৈল দিয়ে—প্রেমের বহ্নিতে "প্রেম-প্রদীপ" জেলে বসে থাকে প্রণয়ীর তরে; কত বিনিদ্র

রজনী কেটে যায়—কত নিষ্ফল চোখের জল আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়—কত গভীর দীর্ঘশ্বাস হতশ্বাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে বার বার বুকে ধাক্কা দেয়! তবুও তারা অচল-অটল! তাদের 'আশা' যেন কখনও 'নিরাশাকে' চেনে নাই!

আমার কাছে তারা চিরপ্রহেলিকা! বুঝ্‌তে পারি না বলেই আমার এত ভাল লাগে তাদের! তাদের হাসিটুকু আমি কুড়িয়ে নিই—বিরক্তিটুকু হাসিমুখে বুক পেতে ধরে রাখি—সোহাগটুকু আবেগ ভরে প্রাণের উপর চেপে ধরি; তাদের চোখের জল অঞ্জলী ভরে সযতনে নিয়ে ঢেলে রাখি আমার হৃদয়-পিয়ালায়!

কেন গীতা বলিল—"বিশ্বাস করি না!"—কেন সে আবার বলিল "বিশ্বাস করি! মিথ্যে কথা বলেছি—আমাকে ক্ষমা করুন"। ক্ষমা কেন চাহিল? কেন জলে ভেসে গেল আঁখি দুটী তার, এই কথা বলতে বলতে!

সেদিন সকালে চা খেয়ে সবেমাত্র খবরের কাগজটী পড়তে বসেছি এমন সময় বেহারা খবর দিয়ে গেল যে বাবু ডাকছেন। কাগজটী টেবিলের উপর রেখে হুকুম তামিল করতে চললাম। দেখি বাগান-ধারের বারাণ্ডায় বসে গীতা তার পিতার সঙ্গে খুব উৎসাহের সহিত কি আলোচনা করছে! আমাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলো "ঐ ডাক্তার বাবু আসছেন!" আমি কাছে যেতেই সে আমার পানে চেয়ে মুচ্‌কে হাসতে লাগলো! যোগেশ বাবু আমাকে দেখেই বললেন—"এই যে ডাক্তার, বোস বোস!" পরে গীতার দিকে

চেয়ে হেসে বললেন "ডাক্তার—আমি তোমাকে ডাকি নি। গীতাই, আমার নাম করে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল !"

গীতার মুখ-চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো ! হো হো করে হেসে উঠে যোগেশবাবু বললেন "এতে আর লজ্জা কিসের রে ? আমার নাম করে ডাকলেই বা ! ডাক্তার গীতা আজ নিজে, রেঁধে আমাদের সকলকে খাওয়াবে। ও বলছে খাবারের 'মেন্যু'টা তোমাকে করে দিতে হবে ; অর্থাৎ তুমি যা খেতে ভালবাস তাই বলবে। এইবার সব জিনিষগুলোর অর্ডার করে দাও !"

প্রথমটা এই কথাগুলো শুনে আমারও ভারি লজ্জা হয়েছিল ; সামলে নিয়ে বললাম—"বেশ তো—সে তো খুব মজার কথা ! আচ্ছা বাড়ীতে না খেয়ে চড়িভাতি করলে ভাল হয় না ?"

তাড়াতাড়ি গীতা বলে উঠলো—"ঠিক বলেছেন ! সেই সব চেয়ে ভাল হবে।" যোগেশ বাবুও এতে মতপ্রকাশ করে বললেন —"আজ আর বেড়াতে যাব না। যাও তোমরা দু'জনে মিলে চড়িভাতির বন্দোবস্তটা করে ফেল !"

বারান্দার পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম ; গীতা আমার সামনে বসে বললে "বাড়ী থেকে কিছু নেব না ! সব কিনে আনা হবে,— তা না হলে চড়িভাতির আমোদ মোটেই হবে না ; কি বলেন ?" হেসে বললাম—"ঠিক ! কি কি আনতে হবে বলুন আমিই সব কিনে আনবো !"

খুব উৎসাহিত হয়ে নিপুণ গৃহিণীর মত গীতা বলিল—"নিন্ আমি যা বলি সব লিখে যান।" এইস্থলে সে লবণ হতে আরম্ভ

করে তেজপাতা, লঙ্কা আলু প্রভৃতি সব বলে যেতে লাগলো! কোনটী কত খানি লাগবে তাও বলতে লাগলো; আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে বিলাসিতায়, সাজসজ্জায় একটী মেম সাহেব এই মেয়েটী কেমন করে নিপুণ গৃহিণীর মত গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শিখিল?

আমার লেখা শেষ হয়ে গেলে গীতা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি একবার পড়ে দেখুন তো কোনও জিনিষ বাদ পড়ে গেল কিনা?"

হেসে বললাম—"আমি কি রান্না করতে জানি যে বলতে পারবো। আর যদিই জানি তা'হলেই বা বলবো কেন? আপনি রাঁধবেন; আপনিই বলুন কিছু বাদ পড়েছে কিনা।"

গীতা—"আচ্ছা কাগজটা দিন আমিই একবার দেখি।" কাগজটা নিয়ে বলে উঠলো—"বাঃ আপনার লেখা তো ভারী সুন্দর!"

হাসতে হাসতে বললাম—"শুধু কি লেখা—সবই আমার সুন্দর!" সে হেসে বললে—"তা বই কি!" বললাম—"কেন? আমার কোন খানটা খারাপ!" অম্লানভাবে সে বললে—"আপনার সবটাই খারাপ!"

হেসে বলে উঠলাম—"কি রকম—শুনি?"

গীতা—"এই আপনাকে যে একবার দেখবে কখনও সে আপনাকে ভুলতে পারবে না! এই জন্যেই আপনার সবটাই খারাপ!"

বললাম—"কেন?"

সে বললে—"কেন, আবার কি। মানুষ যে খারাপ কাজটা করে, সেটা কখনও সে ভুলতে পারে না। সেই জন্যেই বলছি যেটা মনেতে সব চেয়ে জোরে আঁকড়ে ধরে থাকে সেটাই সব চেয়ে খারাপ!"

গীতার এই কথাটা তখন ঠিক বুঝতে পারি নাই। এখন বুঝেছি, হয়তো গীতা আমাকে ভুলতে পারবে না। তাই আমি তার কাছে খারাপ! সত্যই কি, মনেতে যেটা বেশী জড়িয়ে থাকে সেটাই সব চেয়ে খারাপ? হয়তো ঠিক তাই! ভালবাসা! বুকের রক্ত দিয়ে—প্রাণের স্পন্দন দিয়ে—জীবনকে বলি দিয়ে যে ভালবাসাকে আমরা পেতে চাই কখনও কি আমরা তাকে পূর্ণ মাত্রায় পাই? যদি বিফল হই—চির-আর্ত্তনাদের, চির-হাহাকারের জ্বালায় জ্বলতে থাকি; আর যদি সফল হই কখনও আমরা পেয়েও তৃপ্ত হই না! মনে হয় আরও—আরও—আরও চাই—এখনও পেতে অনেক বাকী! এই অলীক আশার আকিঞ্চনে বসে থাকি আজীবন! কখনও শান্তি পাই না—কখনও তৃপ্ত হই না!

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কখন বাজারে যাবেন?—" বললাম্ "এখনি যাব!"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গীতা বলিল—"চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই!"

চড়িভাতি হবে Valley garden'এ; জিনিষ পত্র নিয়ে নৌকাযোগে ভ্যালি গার্ডেন এ গেলাম! বাগানের ভিতরে একটী ছোট বাংলো আছে Picnic partyদের জন্যেই বোধ হয় এই

বাংলোটী তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিষই ঘরে সাজানো আছে। ঘর হ'তে বেরিয়ে যোগেশ বাবু বললেন—"বেশ জায়গাটীতো! আর আজ দিনটাও মেঘ্‌লা আছে তোমাদের চড়িভাতি জমবেও খুব ভাল! তোমরা এইবার রান্না আরম্ভ করে দাও—আমি ততক্ষণ বাগানটা একটু দেখে আসি! গীতা আজ দেখবো তুই কত বড় রাঁধুনি!" এই বলে হাসতে হাসতে তিনি বাগান দেখতে বেরুলেন!

গীতা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে—ঐ ডেকৃচি দুটো নিয়ে আসুন; এইবার রান্না আরম্ভ করে দিই।"

ডেকৃচি দুটো তুলতে যাবো এমন সময় সে বলিয়া উঠিল—"দাঁড়ান—ঐ মুরগী দুটো কাটার বন্দোবস্ত করুন?" মৃদুহেসে বললাম—"বন্দোবস্ত তো হয়েই রয়েছে! আপনি ওই পুরোত-ঠাকুরদের বাহন দুটীকে জবাই করুন আমি ততক্ষণ জিনিষগুলো রান্নাঘরে রেখে আসি!"

সভয়ে হেসে সে বলে উঠলো "ওরে বাপ্‌রে—আমি এদের কিছুতেই কাটতে পারবো না!- কিছুতেই না!" কপট চিন্তিত ভাবে বললাম—"তবেইতো মুস্কিল! এদেশের কেউ মুরগী কাটবে না তো!"

গীতা—"কেন আপনিই দিন না জবাই করে!" হেসে বললাম —"হ্যাঁ একেই বলে মেয়ে মানুষ!"

আমার কথায় সে হাসতে লাগলো! পরে বললাম—"আচ্ছা আপনি যখন বলছেন- আমিই দিই কেটে।" দুটীর গলায় ছুরী

বসিয়ে দিলাম; ঝলকে ঝলকে গরম রক্ত উথলে উথলে পড়তে লাগলো। তাদের মৃত্যুর করুণ কান্না শুনে গীতার ব্যথিত হৃদয় হ'তে কেবল—"আহা"!" কথাটী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো।

গীতার মুখপানে চেয়ে বললাম—"তা বইকি! কেনবার সময়ও 'আহা' বেরিয়েছিল—কাট্‌বার সময়ও 'আহা' বেরুলো—আবার খাবার সময়ও 'আহা' বেরুবে!

করুণ স্বরে গীতা বলিল--"ছিঃ!"

ঠিক্! নারী যে কোমল প্রাণা! সামান্য নিষ্ঠুরতাও যে সহ্য করতে পারেনা সে কি কখনও এতবড় পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে পারে? হোক্ সে আধুনিক শিক্ষা-সম্পন্না, হোক সে বিলাতী বিলাসিতা-মণ্ডিতা তবু সে নারী! যত কঠোর সে হোক না কেন—এ দৃশ্য-দেখে একটুও ব্যথা নিশ্চয়ই সে পাবে!

অনেক ধূম করে উনান ধরানো হ'ল! এইটা যদিও সহজ বলে মনে হয় –কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ কাজটা শক্ত। গীতা ডেকৃচি চড়াতে যাচ্ছিল হঠাৎ আমি বলে উঠলাম—"আরে কি করছেন; জুতোটা খুলে ফেলুন! না-জুতোটা পরেই রান্না হবে?"

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন!"

গম্ভীর ভাবে বললাম—"কেন বললে কি হয়! ব্রাহ্মণকে খাওয়ান ভারী শক্ত কাজ! শুদ্ধাচারে রান্না করতে হয়! চামড়া যে অশুদ্ধ!" সে বলে উঠলো।—"ভারী তো বামুণ! অমন তিন গাছা সুতো লাগিয়ে সকলেই বামুণ হতে পারে।" বললাম—"কি করি বলুন, গ্রহের ফেরে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হয়েছে! দেশের

কুলাঙ্গারতো আমরাই! যত অনাচার—অত্যাচার কত অনাসৃষ্টিই করি! তা যাই হোক আমার এ অত্যাচারটুকু আপনাকে সইতে হবে!"

সে হেসে বলে উঠলো—"যান খুব বক্তৃতা হয়েছে! মুরগী খবার বেলা জাত যাবে না—আর জুতো পরলেই যত জাত সব চলে যাবে! জুতো পরে তো সবই এনেছি তাহলে কিছুই খাবেন না বলুন!"

আমি বললাম—"গতস্য শোচনা নাস্তি! যদি বা কিছু অশুদ্ধ ছিল, আমি সঙ্গে ছিলুম বলে সব শুদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইচ্ছে করলেই সব শুদ্ধ করতে পারি!

সে হেসে বললে "তবে আমার এ জুতোটাও তো শুদ্ধ হয়ে গেছে?" এই বলে হাসির বেগ সম্বরণ করিয়া গীতা পুনরায় বলিল—"ওঃ—তাই নাকি! আচ্ছা ওই ঘরে পিঁয়াজ আছে গোটাকতক কুচিয়ে নিয়ে আসুন তো! বেশী দেরী করবেন না যেন!"

চড়িভাতির এ আমোদ অনেক দিন ভাগ্যে জুটে নাই। মনে পড়ে, কালেজে যখন পড়তাম আমাদের একবার চড়িভাতি হয়েছিল আগরপাড়ায়! গঙ্গার ঠিক উপরেই বাড়ী! ছুটোপাটী দৌড়াদৌড়ী করা একবার জল আনা, একবার মসলা বাটা—একবার বা খুন্তী নাড়া এমনি করে চড়িভাতির রান্না হয়েছিল। তারপর দুপুর বেলা গঙ্গায় সাঁতার দেওয়া কি সে স্ফূর্ত্তী! "বরাট" সাঁতার জানতো না; তাকে আমরা সকলে ঠেলে জলে ফেলে দিলাম। কি তার বুকভরা ভয়—কি তাঁর ব্যাকুল-করা মিনতি। আমরা

সব হেসে উঠলাম! তারপর শোভনের কুমীরের ভয়—মিতের তাড়াতাড়ী বাড়ী ফেরবার ভাবনা—জ্যোতিশের বেহালা বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচা, এই সব নিয়ে হাসিতে—গানেতে—ঠাট্টাতে আমাদের সেই শেষ চড়িভাতি শেষ হলো।•

আর এই এক চড়িভাতি! মনে ভারী স্ফূর্ত্তী এলো; ঘরের ভেতর না বসে বারান্দার এক গাছতলায় বসে পিঁয়াজ কুচাতে লাগলাম! হঠাৎ শুনলাম গীতা ডাকছে—"বামুণ ঠাকুর—ও বামুণ ঠাকুর?" প্রথমে বুঝতে পারি নাই কাকে ডাকছে গীতা। পরে আবার সে ডেকে উঠলো—"ও বামুণ ঠাকুর—এখন ও পিঁয়াজ কুচানো হলো না!"

রহস্য করে বললাম—"এই যে দিদিমণি হয়ে গেছে; যাচ্ছি!" কাছে গিয়ে দেখি সত্য সত্যই গীতা পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে! কাপড় কোমরে জড়িয়ে—এলো বেণী মাথার উপরে ঘুরিয়ে বেঁধে রান্না করছে! আগুনের আভায় মুখখানি তার আবিরের মত লাল হয়ে উঠেছে। করবী ফুলের পাপড়ীর মত টুক্‌টুকে লাল ঠোঁঠের উপরে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম এক একটী মুক্তার মত চক্‌চক্ করছে! পিঁয়াজগুলি আমার হাত হ'তে নিয়ে ডেক্‌চিতে গরম ঘিয়ের উপর ফেলে দিল! আমি বললাম—"তাহলে কি সত্য সত্যই আজ এখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন হচ্ছে?" হেসে সে বললে—"ইচ্ছেটা তো সেই রকমই!" বললাম—"যদি তাই হয় ব্রাহ্মণ তা'হ'লে অনুমতি দিচ্ছে জুতোটা পরা হোক্! সে শুদ্ধ করে দিয়েছে!" সেই ভাবেই হাসতে হাসতে সে বললে—"অসুবিধা মোটেই হয়নি বরং

না পরে অনেক সুবিধে হচ্ছে!" আর কোনও কথা না বলে ছাড়ানো আলুগুলো জলে ধুতে লাগলাম! মাংস নাড়তে নাড়তে গীতা বলে উঠলো—"বামুণ ঠাকুর কি ঐ পাতকুয়া থেকে খাবার জল এক বাল্‌তি আন্‌তে পারবে?" চেয়ে দেখি এই কথাগুলি বলে সে ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে ধরে খুব হাসছে। আমিও মুখ নীচু করে বললাম—"পারবে!" বলেই জল আন্‌তে গেলাম। পুনরায় রহস্য করে গীতা ডেকে উঠলো—"বামুণঠাকুর শীগ্‌গীর জল নিয়ে এসো—সব বুঝি পুড়ে গেল এখুনি!" ঠিক সবেমাত্র তখন বাল্‌তিতে জল ভরা হয়ে গেছে এমন সময় গীতার ডাক শুনলাম। আমিও বলে উঠলাম—"দিদিমণি—আমি দৌড়ে আস্‌ছি! ভয় নেই, কিছু পুড়বে না!" সিঁড়িতে উঠেই দৌড়াতে লাগলাম, যেন গীতা মনে করে আমি সমস্ত রাস্তাটাই দৌড়ে এসেছি। আমাকে দৌড়ে আসতে দেখে গীতা হো হো করে হেসে উঠলো! পরে হাসতে হাসতেই বললে—"বাঃ আমার বামুণ তো খুব খাটিয়ে?" হেসে বললাম—"ওদের জাতটাই খাটিয়ে। দিদিমণি—শুধু 'খাটিয়ে' নয় ভীষণ 'খাইয়েও! তার জ্যান্ত প্রমাণ, যজ্ঞি-বাড়ীর রাঁধুনী বামুন'রা, আর এই টিকিধারী পণ্ডিতরা!" আমার কথা শুনে, গীতা আরও জোরে হো হো করে হেসে উঠলো।

ঠিক এমনি সময়ে যোগেশ বাবু সিঁড়ীতে উঠতে উঠতে বললেন—"কিরে গীতা—কি হলো? এতো যে হাসছিস্?" গীতা হাসির বেগ সম্বরণ করে নিয়ে বললে—"আচ্ছা বাবা—বলতো, ওই

বামুণ'দের মত ভণ্ড জাত আর কোথাও আছে!" হেসে যোগেশ বাবু বলে উঠলেন—"কেন কি, হয়েছে কি! তুইও তো বামুণ!" গীতা বল্‌লে—"তা হোক্‌! আমি কখনও এঁদের মত ভণ্ডামী করি না! 'হ্যাম্‌'—'ফাউল', সবই খাচ্ছেন তাতে কোনও দোষ নেই কিন্তু ম্লেচ্ছদের ছুঁলেই জাত চলে যাবে! এত ঠুন্‌কো জাত যাদের, তাদের জাত থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি! ভেতরে ভেতরে সবই করেন আর বাইরে কেবল 'ভণ্ডামীর' খোলস পরে বেড়ান!" যোগেশবাবু হেসে একবার আমার দিকে চেয়ে পরে গীতাকে বললেন—"অনেক কথা তো বল্‌লি! এখন আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি? ডাক্তারের সঙ্গে বোধ হয় এই নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে—না?" গীতা হো হো করে হেসে আমার দিকে চেয়ে বললে—"তর্ক হলে তো বরং ভালই হ'ত! আমি জুতো পরে রান্না করছি দেখে ডাক্তার বাবু তো একেবারে লাফিয়ে উঠলেন! ওঁর অনেক সাধের জাত চলে যাবে যদি জুতো পরে রান্না করি। আহা ওঁর জাতের দিকে টান দেখে অগত্যা আমি জুতা খুলে ফেললুম।" বলেই সে আবার হাসতে লাগলো আমার পানে চেয়ে! যোগেশবাবুও হাসতে লাগলেন। পরে তিনি গীতাকে বললেন "ওরে বোকা মেয়ে—তুই কিছুই বুঝিস্‌ নি! ডাক্তার তার জাত বাঁচাবার জন্যে তোকে জুতো খুলতে বলে নি। ও ঠিক তোর মতনই বামুণদের এই ভণ্ডামীর উপর হাড়ে হাড়ে চটা! জুতো খোলাবার মানে আর কিছুই নয়। ও তোকে কেবল শেখাতে চেয়েছে যে

বাঙ্গালীর মেয়ে যতই জুতো জামা পরুক—যতই বিবিয়ানা করুক না কেন সে যখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত সেজে নিজের ঘরের কাজকর্ম্ম করে তখন যেমন তাকে দেখতে হয় এমনটী আর কোনও খানে কোনও বেশে হয় না। বুঝেছিস্ পাগলী ?" এই কথাগুলো শুনে গীতা ঈষৎ হেসে কোমল চোখে আমার পানে চেয়ে রইলো !

একটু পরেই চড়িভাতির খাওয়া আরম্ভ হলো। যোগেশবাবু প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করেন নাই যে এত সুন্দর রান্না গীতা রাঁধতে পেরেছে ! পরে যখন বিশ্বাস হলো যে সত্যই গীতা রেঁধেছে তখন তিনি আনন্দে তার রান্নার কত সুখ্যাতি করলেন। হাসতে হাসতে তিনি গীতার কাঁধদুটী ধরে সস্নেহে বলতে লাগলেন —"দুষ্টু মেয়ে—তুই যে এমন রাঁধতে পারিস্ আমাকে কেন আগে জানতে দিস্‌নি ? ওই ঝুঁটিবাঁধা উড়ে বামুণের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার তো ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরে গেল ! আমার এমন লক্ষ্মীর মত রাঁধুনী মা থাকতে আমি কিনা এতদিন পোড়া-ঝোড়া যা'তা খেয়েছি ! আর খাচ্ছি না ! আমার খাবারগুলো এবার থেকে তোকে রেঁধে দিতে হবে। কেমন দিবি তো ?" প্রশংসা শুনে আহ্লাদ হয় না একথা কেউ বিশ্বাস করে না। প্রশংসা শুনে গীতার হাসিমাখা মুখটী সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠলো। যোগেশবাবু হাসতে হাসতে গীতাকে বললেন—"কই তোর ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাস কর কেমন রান্না হয়েছে ?" সলাজ হাসি মুখে গীতা আমার পানে চাইতেই আমি বলে উঠলাম—"বিশ্রী

হয়েছে !" হেসে সে বলে উঠলো—"ইস্—তা' বই কি !" যোগেশ বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্রমেই দেখলাম গীতার প্রতি আমার যেন একটা অনুরাগ জন্মাচ্ছে। একলা বসে থাকলেই গীতার কথা মনে আসতো। যখনই ভাবতাম সত্যই কি আমি গীতাকে ভালবেসেছি ঠিক তখনই আর একজনের মুখ আগুনের শিখার মত স্পষ্ট হয়ে আমার মনের মাঝে ভেসে উঠতো। মলিনা এখন কোথায় আছে ? এখনও কি সে আমাকে মনে রেখেছে ? এই দীর্ঘ বিরহ যাতনা কি কখনও তার আঁখি হতে দুফোঁটাও অশ্রু আমার জন্য ফেলেছে ! আমার জন্য কখনও কি তার কষ্ট হয়—আমার অভাবে কি কখনও তার বুক হতে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে ! এই রকম অনেক কথা আমার প্রাণে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃজন করতো !

একদিক হতে যেন গীতার হাসিমাখা মুখটী ভেসে উঠে বলতো "তোমাকে আমি ভালবেসেছি—তুমি আমার—তুমি আমার !" গীতার কথা শেষ হতে না হতেই আর একটী মুখ ভেসে উঠতো—সে মলিনা ! গীতার মত তার মুখে ভালবাসার তীব্র চিহ্ন কিছুই ছিল না ; এ মুখ নীরব—শান্ত ! কচি গোলাপ পাপড়ীর মত পাৎলা ঠোঁটদুটী যেন কাঁপতে কাঁপতে বলতো "তুমি কি আমার নও ?" মনে যখন হ'ত যে দুধার হতে দুজনে আমাকে এইসব কথা বলছে আমি তখন ঠিক পাগলের মত হয়ে যেতাম। বুকের ভেতর একটা যাতনা হ'ত। এখনও মনে হলে ভয় হয়, সে কি ভীষণ যাতনা !

স্থির করলাম আর এ বাড়াতে থাকবো না। একদিন যোগেশ বাবুকে বললাম যে আমি আর এখানে থাকতে পারছি না আমাকে বিদায় দিন। যোগেশবাবু প্রথমে থাকবার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন কিন্তু শেষে যখন দেখলেন যে আমি কিছুতেই থাকবো না তখন বললেন "ডাক্তার—আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। তোমার উপর আমার কোন জোর নাই তাই তোমাকে রাখতে পারবো না। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যে তুমি চলে গেলে এই বুড়োর বড় কষ্ট হবে।"

মনে হ'ল চীৎকার করে বলি—"পারবো না থাকতে পারবো না! মায়া কেন দেখাও বৃদ্ধ! তুমি তো জানো না যে এই বুকের ভেতর কত গুলো ঝড় ছুটছে! চারধার হ'তে ধ্বংস করবার জন্যে এরা যে ছুটে আসছে! আগে আমাকে বাঁচতে দাও তারপর তো আমি থাকবো! তুমি চেয়ে ছিলে বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার যে তোমার সঙ্গে ফিটফাট হয়ে সাহেব সেজে থাকতে পারবে। তুমি যা চেয়েছিলে ঠিক তাই পেয়েছ! এবার আমাকে রেহাই দাও!

যোগেশবাবু কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। চলে যাব কিনা স্থির করছি এমন সময় একদিন একটা টেলিগ্রাম পেলাম, মার অসুখ আমি যেন পত্রপাঠ তাঁর কাছে যাই! টেলিগ্রামটি যোগেশ বাবুকে দেখাতে তিনি আমাকে যথাসাধ্য অভয় দিয়ে বাড়ী যাবার অনুমতি দিলেন। যাবার দিন বার বার করে বলেছিলেন, যেন মার অসুখ ভাল হয়ে গেলে আমি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসি।

চলে যাব সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। যাবার দিন গীতা আমার

ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। ঘরে ঢুকেই গীতা বললে—"ডাক্তার বাবু, আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন?" সেই হাসি—আবার সেই হাসি! আস্তে আস্তে বললাম "হাঁ"। খানিকক্ষণ চুপ করে সে বললে—"আপনি কেন চলে যাবেন? আপনার মার কি খুব বেশী অসুখ?" মৃদু হেসে বললাম—"হাঁ—তাঁর অসুখটা খুবই খারাপ।"

গীতা বললে—"আবার ফিরে আসবেন কবে?"

বললাম—"দেখি মার অসুখ সেরে গেলে হয়তো আবার আসবো!"

ম্লান মুখে গীতা বললে—"হয়তো বললে হবে না! আপনাকে আসতেই হবে! কেমন আসবেন তো? আচ্ছা, আমাদের কথা বাড়ী গিয়ে মনে পড়বে?" বললাম—"এখনই তো আপনাদের ছেড়ে যেতে মন-কেমন করছে!" কোমল দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো। মুখে এবার তার আর হাসি নাই। ছল-ছল চোখে বললে "ডাক্তার বাবু আমারও যে আপনার জন্সে মন-কেমন করবে; আমি কেমন কোরে থাকবো?"

ওগো—আর পারছি না! মনে হলো—এইবার বুঝি সব বাঁধ ভেঙ্গে গেল! অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম "ছিঃ কেন মন-কেমন কর্ব্বে? দিন কতক আমাকে বাড়ী যেতে দিন তারপর যখন দরকার হবে আবার আসবো। গীতা কোনও কথা বললে না। টস্‌টস্ করে তার দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মনে হ'ল, আমার বুকের পাঁজরগুলো বুঝি সব ভেঙ্গে গেল! সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল্যো; হয়তো গীতার দিকে

দু'এক পা অগ্রসর হয়েছিলাম এমন সময় চাকরটা এসে বললে যে 'ব্যাণ্ডি' এসেছে।

জিনিষ-পত্র নিয়ে ব্যাণ্ডিতে উঠলাম ; ঘরের দিকে চেয়ে দেখি অপলক দৃষ্টিতে গীতা 'আমার পানে চেয়ে আছে ! মুখে সে দীপ্তি নাই, শিশুর সে সরল হাসি নাই ! ব্যথাভরা চাহনি তার মুখে-চোখে-এসে-পড়া, এলোকেশের ভেতর হ'তে কাঁপতে কাঁপতে এসে যেন আমার বুকের ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল ! তা'র পানে চাইতে গেলাম—অমনি চক্ষু জলে ভরে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

বিষের ঝড়

"কেন নিবে গেল বাতি?
আমি—অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি—
তাই নিবে গেল বাতি!"

"কেন ঝরে গেল ফুল?
আমি—বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল
তাই ঝরে গেল ফুল।"

"কেন ছিঁড়ে দাও তার?
আমি—অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝঙ্কার—
তাই ছিঁড়ে গেল তার!"

তিন

দু'বছর পরে আবার বাড়ীতে আসিলাম। দেখি আমাদের সে সোণার সংসার ভেঙ্গে গেছে। মা আর এ জগতে নেই। তাঁর যে বড় ইচ্ছে ছিল, আমাকে সুখী দেখে মরবেন। পূজার ছুটিতে বাড়ীতে এনে আমাকে তাঁর কাছে রাখবেন কতবার তিনি এই আশা করেছিলেন, কিন্তু তা হলো না।

মানুষ গড়ে—ভগবান ভেঙ্গে দেন। বৃদ্ধ পিতা জীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে বুঝি বা এই সংবাদ দেবার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। আমি যাবার কিছুদিন পরে তিনিও আমাকে একলা ফেলে মা'র কাছে চলে গেলেন। মরবার আগে বলে গেলেন "বিকাশ—যদি ইচ্ছে হয় তাহ'লে একটা বিয়ে ক'র। তোমায় একলা ফেলে যেতে হচ্ছে—বুদ্ধিমান তুমি, তোমায় কি বোঝাব।" স্নেহের টানের অবসান হ'ল! আর বাড়ীতে থাকতে পারলাম না। ঠিক করলাম যে নানা দেশ ঘুরে ঘুরে জীবনের বাকিটা শেষ করে দেব। জাহাজে চাকুরীও ঠিক হল কিন্তু যাবার আগে গীতাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হ'ল। মনে পড়ে বিলাত যাবার আগে মলিনাকে দেখবার জন্যও ঠিক মনটা এমনই চঞ্চল হয়েছিল!

আবার ওয়ালটেয়ারে ছুটলাম; বীচ হোটেলে গিয়ে উঠি। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বীচের উপর দিয়ে চলিলাম যোগেশবাবুর বাড়ীর দিকে। দেখি বাড়ী বন্ধ—দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে।

তবে কি গীতারা নেই ? বাড়ীর চারধারটা একবার ঘুরে দেখি, সব বন্ধ। সমস্ত বাড়ীখানা যেন একটা বিকট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। রাত তখনো বেশী হয়নি। কিন্তু তা' হলেও এই স্থানটা অতি নির্জ্জন। অদূরে শান্ত সাগরের মৃদু গুরু গর্জ্জন নিবিড় অন্ধকারের গভীরতা আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই অন্ধকারের বুক চিরে বড় বড় নারিকেল গাছগুলা হাওয়ায় দুলছিল কিন্তু দেখলেই মনে হয়, এরা যেন প্রেতের নৃত্য করছে।

ধীরে ধীরে বীচের ওপর নেমে এলাম। হঠাৎ একটা হাহা—হাহা—শব্দ শুনলাম। একি—সেই হাসি যে! এ হাসি যে গীতা ছাড়া আর কেউ হাসতে পারে না! তবে কি গীতারা এখানে আছে ? চীৎকার করে ডাকলাম "গীতা—গীতা—গীতা !!" কোথাও কোন সাড়া নাই। দূরে, বিজন সাগরের কূলে কূলে প্রতিধ্বনি যেন ছুটতে ছুটতে বলে গেল "কোথা !—কোথা !—কোথা !" দৌড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকে দেখি কেউ কোথাও নেই কেবল কতকগুলো শুক্‌নো পাতা হাওয়ায় সড়্ সড়্ করে উড়ছে।

বুকের ভেতর এমন একটা কাঁপুনি এলো যে আর দাঁড়াতে পারলাম না। দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে বুকটা চেপে ধরে বীচের ওপর নেমে এলাম। কত কথাই না মনে এল! আমি কি সত্যই পাগল হয়েছি নইলে দিশাহীন লক্ষ্যহীন ঘুরে মরব কেন ? কোন পিশাচী আমাকে এমন করলে ? ঈশ্বর—তোমার কি এতটুকুও দয়া নেই ? একটা মানুষকে আর কত কষ্ট দেবে প্রভু ! দুচোখ দিয়ে হুহু করে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিশ্বের ঝড়

আকাশের পানে চেয়ে দেখি, দূরে যেখানে সীমাহীন, দিশাহীন সাগর গিয়ে মিশেছে নিবিড় তমসাবৃত অনন্ত আকাশের গায়ে—হঠাৎ সেখানে দমকা হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়া আবীরের মত একটা সিন্দূর রঙের আভা চারিদিক হ'তে ফেটে বেরুচ্ছে! অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি সেইখানে একটা রক্তমাখা থালার মত কি একটা জিনিষ আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মনের ভেতর কে যেন বল্‌লে "এই ভগবান!" আবার চখের জলধারা নেমে এলো। তেমনি ভাবে তখনও চেয়েছিলাম সেই রক্তমাখা জিনিষটার পানে। যতই সে আকাশের উপর ওঠে ততই তার রং ফিকে হয়ে যেতে লাগলো; আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও কেটে গেল। কিছু পরে সেই জিনিষটার ভেতর হতে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বেরিয়ে সমস্ত জগতকে আলো করে দিল। চাঁদের আলো দেখে সাগর আনন্দে দুলতে লাগলো; সলাজ নববধূর মত তারার দল ঘন মেঘের ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে সাগরের দোল দেখতে এলো। চারিদিকে সকলেই তৃপ্ত হলো—হাওয়াও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো!

মানুষ যখন দুঃখকষ্টের ভারে অবনত—তীব্র শোকে মূহ্যমান, তখন যদি সে জ্যোৎস্না-মাখা নিশীথ রাতে বসন্তের হাওয়ায় হাজার হাজার ফুলের হাসিতে গড়াগড়ী যাওয়া—অধরে অধরে চুমা খাওয়াখায়ী দেখে কিছু না কিছু শান্ত সে হয়। অনেকটা চোখের জল বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে কেমন একটা অবসাদ এলো। বালুর ওপর শুয়ে-পড়ে আকাশপানে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ কে আমার চোখ টিপে ধরলে। মনে হ'ল এ নিশ্চয়ই গীতা! ভারী অভিমান হ'ল; কেন সে আমাকে এত কষ্ট দিলে। ভগ্নস্বরে ডেকে উঠলাম্ "গীতা!" উঠে দেখি সে গীতা নয়— অরুণ! আবাক হয়ে বললাম "ভাই ভাল—অরুণ তুই কি করে এলি; আকাশ থেকে নেমে এলি না কি!"

সে হেসে বল্লে "হ্যাঁ তা বই কি! আকাশ থেকে আমি নেমে এলুম্—না তুই! দেশে খুব নামও কিনেছিস— আর পয়সাও যথেষ্ট রোজগার করছিস—এখন আর আমাকে কি চিন্তে পারিস! আর সত্যিই তো কি করে চিনবি বল—ভদ্রতায় বাধে যে! সমানে সমানে হলেও বা কথা ছিল—কি বল?"

উত্তেজিত হয়ে বললাম "অরুণ ভদ্রতা কি আজ আমাকে তোর কাছে শিখতে হবে? লজ্জা করলো না কথাগুলো বল্‌তে! দেশে যে ফিরে এসেছিস সে খবরটাও তো দিতে পারতিস্? তোর মত অভদ্র আর কেউ আছে বলেতো মনে হয় না!"

অরুণ একেবারে চুপ হয়ে গেল; আর একটা কথাও বললে না। খানিক বাদে আর চুপ করে না থাকতে পেরে অরুণের হাত দুটা চেপে ধরে বললাম "না অরুণ তুই রাগ করিস্ নি। নিজে অভদ্র বলেই সকলকেই মনে করি অভদ্র। কিছু মনে করিস নি ভাই— বুঝলি? দেখ কখনও কাউকে আপনার করে নিতে পারিনি। কিন্তু তোর সঙ্গে আলাপ হ'বার পর হঠাৎ একদিন দেখি তোকে অনেকটা ভালবেসে ফেলেছি। তার জন্য দায়ী আমি। তাই এতদিন বাদে আজ তোকে দেখতে পেয়ে স্নেহের যাতনায় যদি

কিছু বলে থাকি তুই আমাকে ক্ষমা কর ভাই! আমি বড় স্বার্থপর তাই যাকেই দেখি নিজের মত ভেবে তাকে যা তা বলে ফেলি! কিছু মনে করিস নি।"

দৃঢ়ভাবে অরুণ আমার হাতটা চেপে ধরে বললে "বিকাশ—কি কি হয়েছে তোর! এ সব কি বলছিস?" শান্তভাবে বললাম "নূতন তো কিছু নয় অরুণ! যাদের আপনার বলে ভেবেছিলাম—যাদের উপর বেশ একটু ভালবাসার অধিকারও জন্মেছিল সকলেই তো একে একে স্বপ্নের মত ছেড়ে চলে গেছে; তুইও যে যাবি সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়!"

অরুণ আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো "বিকাশ—চুপ! আর একটা কথাও বলবি না।" তারপর আস্তে আস্তে স্নেহজড়িত স্বরে বললে "বল দেখি বিকাশ তোর কি হয়েছে?"

বললাম "কিছুই না!"

অভিমানের স্বরে সে বললে "বলবি না তো!" আমি হেসে বললাম "সত্যি বলছি কিছুই হয় নি!"

দুষ্টামি মাখান হাসি মুখে বললে "কিছু হয়নি বললেই কি হয়! বলি গীতাটী কে?" আমি চমকে উঠে বললাম "কোন গীতা?" সেই ভাবেই অরুণ বললে "যে গীতার নাম শুয়ে শুয়ে জপ করা হচ্ছিল সেই গীতা!" হেসে বললাম—"দূর পাগলা—গীতা আবার কে?" সে বললে "তা বইকি! বল বলছি?" হেসে বললাম—"আচ্ছা একদিন বলবো; আজ আর নয়।"

সে বললে "মনে থাকবে তো।"

আমি বললাম "নিশ্চয়ই থাকবে।"

সে বললে—"চল্ আমার বাড়ীতে চল ; এখানে বসে কি হবে !"

দুজনে উঠে ভিজাগাপাটামের দিকে চললাম।

মাইল খানেক হেঁটে অরুণের বাড়ীতে এলাম। দোতলা বাড়ীটি রীতিমত সাহেবী ধরণে সাজানো। নীচের ঘরে টেবিল ল্যাম্পটী মিটু মিটু করে জ্বলছিল ; অরুণ আলোটী একটু জোর করে দিয়ে বললে "আয় তোকে আজ একটা জিনিষ দেখাবো।" অরুণের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। সিঁড়ীর কাছে এসে অরুণ বললে "খুব আস্তে পা টিপে টিপে আয় !"

উপরে উঠে অরুণ হল ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে "ঐ দেখ ! কে বল দেখি !"

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তারগুলো এক সঙ্গে বুকের ভেতর যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ! মনে হ'ল এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন—এ নিশ্চয়ই মিথ্যা ! সত্য কি করে হবে ? যদি এ সত্য হয় তা হলে, ভগবান মিথ্যা—সৃষ্টি মিথ্যা, দুনিয়া মিথ্যা ! বুকের ভেতর যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। আস্তে বললাম "কে—অরুণ ?"

হেসে অরুণ বলে উঠলো "বুঝতে পারলি না ? আচ্ছা আয় ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি !" ঘরের ভিতর ঢুকেই অরুণ বললে "মলিনা !" নাম শুনেই একেবারে চমকে উঠলাম ! স্থির দৃষ্টিতে দেখলাম 'মলিনা ঘরের ভিতর একটী সোফাতে কোণাকুণি হয়ে বসে কি সেলাই করছিল। জাপানী ঘাসের চটী এক পাটি তার

পায়ে লাগানো ছিল আর এক পাটি মেজের কার্পেটের উপর পড়ে ছিল। এত তন্ময় হয়ে সে সেলাই করছিল যে অরুণের স্বরে চম্‌কে উঠে আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি নির্ব্বাক হয়ে তার পানে চেয়েছিলাম আর সেও অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে ছিল। আমাকে কোনও কথা না বলতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কে? কাকে চান?" আমি তো অবাক! বললাম, "আমাকে অরুণ ওপরে নিয়ে এলো! এই যে—অরুণ, অরুণ!" পিছন ফিরে দেখি, অরুণ সরে পড়েছে! ভীতা হয়ে মলিনা বললে "তিনি তো বাড়ীতে নেই? আপনাকে তিনি কি করে ওপরে নিয়ে এলেন? যান এখনি নীচে নেমে যান!" ঠিক এই সময় অরুণ পাশের ঘর হতে বেরিয়ে এসে বল্‌লে "সেকি মলিনা তুমি আমার বন্ধুকে এমনি ভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছ? এ যে ভারী অভিমানী! একবার দেখতে হয় তো আমি বাড়ীতে এসেছি কি না!" অরুণের মুখে এই কথা শুনে ভয়ে ও লজ্জায় মলিনার মুখটী একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছলো। কোনও কথা সে বল্‌তে পারলে না। অরুণ আমার পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে "শোন ইনি কে?" সে দু'হাত দিয়ে মলিনার হাত দুটী ধরে তারই মুখ পানে চেয়ে সুর করে বল্‌তে লাগলো "এ আমার সপ্তসুরের শ্রেষ্ঠ রাগিণী—আঁধার হিয়ার লক্ষ্যমণি—জীবন-মরণের চিরসঙ্গিনী!"

আমার জলন্ত চোখ দুটো চেয়ে ছিল মলিনার মুখের পানে। অরুণের ঐ কথাগুলো শুনে তাঁর গাল দুটী রক্তজবা কুঁড়ীর মত

লাল হয়ে উঠলো। কই মলিনার তো আমাকে দেখে ভাবের পরিবর্ত্তন হ'ল না? বিয়ের রাতে শুভ-দৃষ্টির সময় তাকে যেমনটী দেখেছিলাম ঠিক তেমনি স্পষ্ট তো দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে ওই সলাজ হাসি ওকি আমার চোখ হতে মুছে যেতে পারে? আমি কি সত্যই তবে এত বদ্‌লে গেছি যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় যে সেও আমাকে চিন্‌তে পারলে না! মনে হ'ল চীৎকার করে বলি—ওগো আমার বিয়ের রাতের প্রতিমূর্ত্তি একবার তুমি এসে দেখিয়ে দাও কে আজ মলিনার সামনে দাঁড়িয়ে। হয়তো মলিনার খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল তার ওপর কিছুদিন বাদেই পরস্পরের দেখা বন্ধ হয়েছিল বলে আমাকে সে চিন্‌তে পারলে না! কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি—কেন সে পারলে না? স্ত্রী যে আজ তার স্বামীকে চিনতে পারলে না এর জন্য দায়ী কে?

তারপর অরুণ মলিনাকে বললে "একে তুমি চিনতে পারলে না?"

সলাজ হাসি মাখা মুখে সে বললে "বেশ তো! কিছুই তো বললে না কি করে চিনতে পারবো?"

হাসতে হাসতে অরুণ বললে "বিকাশের কথা যে বলতুম মনে নেই? বিলাত যাবার সময় যা'র সঙ্গে জাহাজে আলাপ হয় ইনিই সেই বিকাশ! ইনি বেশ একজন বড় ডাক্তার!"

'বিকাশ' নাম শুনেই মলিনা প্রথমে যেন একটু চম্‌কে উঠলো! ক্ষণিকের তরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। পরে সলাজ হাসি-বিজড়িত মুখে ছোট্ট হাত দুটী জোড় করে আমাকে একটী

নমস্কার করে বললে—"আমি না জেনে আপনাকে অপমান করেছি—আমাকে ক্ষমা করুন!" আমি মৃদু হেসে বললাম "আপনি তো বলতে গেলে কিছুই করেন নি। অন্য কেউ হ'লে এই অবস্থায় আমাকে হয়ত অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হ'ত!" মলিনা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে বলবার আগেই অরুণ বলে উঠলো "তুমি ক্ষমা চাইলে কি হবে? দেখলে তো বিকাশ তো তোমাকে ক্ষমা একেবারেই করলে না! অতএব তোমার শাস্তি হচ্ছে যে এখনি তুমি বিকাশকে একটা গান শুনিয়ে দাও!" এই বলে সে মলিনার কাঁধ দুটী ধ'রে একেবারে বাজনার সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। দুর্দ্দান্ত লজ্জার ভারে মলিনার মুখটী সিন্দূরের মত লাল হয়ে উঠলো। একটু ইতস্ততঃ করে সে গানে দু'এক লাইন বাজিয়ে গাইতে লাগলো—

"যদি এ আমার, হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥

যদি কোন দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চির-দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥"

বাজনা থেমে গেল ; ভাবলাম কি করুণ গান! হায় গানটা যদি মলিনার অন্তরের কথা হ'ত, মূর্ত্তিমান হয়ে তার মাঝে ফুটে উঠ্‌তো! 'দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসে মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু' যেন বুকের ওপর কাঁদতে কাঁদতে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগলো!

এই তো কটা দিনের ব্যবধান ইচ্ছে করলে দিনগুলাকে স্পষ্ট গোনা যায় এর মধ্যে মলিনার এত পরিবর্ত্তন ঘটেছে! একটা জিনিষ মলিনার দেখলাম—অপরিচিতের সহিত মিশবার তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা! এমন ভাবে সে কথা কইতে লাগলো যেন আমি তার কতদিনের পরিচিত!

যদিও মাঝে মাঝে আমি দু'একটা কথায় উত্তর দিচ্ছিলাম—কিন্তু বেশীর ভাগ কথাই বলছিল মলিনা। মাঝে অরুণ বল্লে উঠলো "কিরে বিকাশ একেবার যে বোবা হয়ে গেলি!" আমি মৃদু হাসিয়া তাহার কথায় উত্তর দিলাম। মনে মনে বলিলাম, "বলবার আর কিছু নেই অরুণ!"

টং টং করে দশটা বেজে গেল ; চেয়ার হতে উঠে অরুণকে বললাম—"যাই ভাই অনেক রাত হয়ে গেল।" পরে মলিনার দিকে চেয়ে একটী নমস্কার করে ঘর হতে বেরিয়ে গেলাম। মলিনাকে হয়তো কিছু বলতাম কিন্তু তার মুখপানে চেয়ে আর কিছু বল্‌তে পারলাম না। সিঁড়িতে নামতে যাব এমনি সময় অরুণ আমার প্যাণ্ট্‌লেনের পিছনটা ধরে টান্‌তে টান্‌তে এনে একেবারে ঘরের সোফার ওপর বসিয়ে দিলে। পরে হাসতে হাসতে বললে—"যাই

বল্লেই আর যাওয়া হয় না! সব সময় নিজের ইচ্ছে খাটে না—বুঝেছ!" অরুণের কাণ্ড দেখে মলিনা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সে রাত্রে মলিনা আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় হোটেল অবধি দু'জনে আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। তাহারা ফিরিবার সময়, পরদিন ও রাত্রি দুবেলারই নিমন্ত্রণ করে গেল।

হায় অদৃষ্টের পরিহাস! আজ আমারই মলিনা আমাকেই নিমন্ত্রণ করে গেল, তারই গৃহে! গুমরেপড়া প্রাণটাকে নিয়ে কোনও রকমে হোটেলের সুখশয্যাতেই শুয়ে পড়লুম! মানসিক ঘাত প্রতিঘাতের দারুণ অবসাদে একঘুমেই রাত্রিটুকু কাটিয়ে দিলুম। ভোর হতে না হতেই দেখি দুইজনে আমার হোটেলে এসে হাজির। কিছুতেই ছাড়িবে না; আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হ'ল! কি করি ভদ্রতার খাতিরে বললাম "আজ যখন দয়া করে এতদূরে এসেছেন তখন আজ এখানে চাও খেতে হবে!" মলিনা কিছু না বলে হাসতে হাসতে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়্লো। অরুণ বল্লে "বিকাশ, মলিনা কিন্তু তোকে চা' খাবারও নেমন্তন্ন করেছিল!" আমি বললাম—বেশতো আমি কি এতই Dyspeptic একবার চা খেয়ে আর একবার পারবো না? এখানেও খাব পুনশ্চ ওখানেও খাব!"

তাঁদের সঙ্গে পায়চারী করতে করতে অরুণের বাড়ীতে এলাম; ঘরে ঢুকেই দেখি একটী প্রায় চার বছরের মেয়ে মাটীতে বসে

একটা বিড়ালছানা নিয়ে খেলা করছে। ভারী সুন্দর দেখতে! ঘন কোঁকড়া চুলের রাশ কচিমুখ খানির চারধারে পুষ্পগুচ্ছের মত ঝুলে ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম "অরুণ এটী তোর মেয়ে—না!" সে হাসতে হাসতে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে "হ্যাঁ।" তার পর মেয়েটীর পানে চেয়ে বললে "আয় মীনা—আয়।" বিড়ালছানা হাতে করে মীনা দৌড়ে অরুণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার পানে বিস্ময়দৃষ্টিতে চেয়ে অরুণের কানে কানে একটা কথা বললে। অরুণ হেসে বলে উঠলো "তোর কাকা হয়রে!" আমি মীনার দিকে হাত বাড়াতেই ঝাঁপিয়ে সে আমার কোলে এলো।

মীনাকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বল্‌লাম, সোনার খুকুমণি—তুই আমার কে। কেন তুই হঠাৎ এত ভালবেসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে এলি! একবার যদি জানতে পারিস্, আমি তোর কে তা' হ'লে তোর ঐ নিষ্কলঙ্ক শিশুহৃদয় এখনি যে কুৎসিত ঘৃণায় ভরে উঠবে! আর কখনও তুই আমাকে ভাল বাসবি না! কিন্তু কখনও তুই আমাকে চিন্‌তে পারবি না—তোকে চিন্‌তে দেবো না। তুই আমার কেউ নস—তুই মলিনার খুকুমণি! খুকুমণি আয় দু'জনে মিলে ভগবানকে ডাকি যেন তিনি তোকে বাঁচিয়ে রাখেন—আমার মত অভিশপ্ত ভাগ্য যেন তোর কপালে না লিখে দেন! সোনা আমার—মাণিক আমার—সত্য আমার আমাকে যেন ভুলিস্ নি খুকুমণি!

অরুণ বলে উঠলো "কিরে মীনা কার কোলে গেছিস্?"

খুকু এতক্ষণ আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর মুখ রেখে শুয়েছিল। বাপের গলা শুনে মুখ তুলে বললে "কাকা!"

সকালে খাওয়া দাওয়ার পর আমি আর অরুণ বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলাম। দুজনে সামনা-সামনি দুটো সোফাতে বসে-ছিলাম আর মাঝখানে ছিল একটা শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। অরুণ একখানা এলবাম্ হতে ছবি এনে তার বাড়ীর সকলের ছবি আমাকে দেখাতে লাগলো। হঠাৎ একখানা ছবি দেখে চম্‌কে উঠে বল্‌লাম "অরুণ এ মেয়েটী কেরে?"

অরুণ হেসে বল্‌লে "কেন বল দেখি! ভারী ব্যস্ত যে!" অনেকক্ষণ ছবিটী দেখে বল্‌লাম "কার ছবিরে!" অরুণ সেই ভাবেই বললে "কার আবার' এ আমার!" আমি বললাম—"না না তা' বলছি না। জিজ্ঞেস করছি যে, ঐ মেয়েটী কে!"

অরুণ বললে "তুই একে চিনিস্!"

বললাম "হাঁ—খুব ভাল করে চিনি! এর নাম কি গীতা।"

অরুণ অবাকদৃষ্টিতে বললে "তুই একে কি করে চিনলি? এযে আমার নিজের বোন রে!"

ধীরে ধীরে বললাম "সে অনেক কথা।" বিস্ময়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করলে "তা'হ'লে তুই যে সেদিন সমুদ্রের ধারে গীতাকে ডাকছিলি সে আমারই বোন!

অস্ফুটস্বরে বললাম "হ্যাঁ—তাইত দাঁড়াচ্ছে দেখ্‌ছি!"

আর কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না। এও কি সম্ভব যে অরুণ গীতার ভাই, যোগেশবাবুর মাত্র ঐ এক সন্তান!

অরুণের হাত চেপে ধরে বললাম—"অরুণ সত্যি বলছিস্ এ তোর বোন?"

অরুণ বল্‌লে—"হাঁ" অসীম বিস্ময়ে ও দারুণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে—অরুণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"গীতার কথা তুই এতবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন বল্ দেখি; কি করে তুই ওকে চিন্‌লি?" তাহার কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার মত মানসিক শক্তি বা প্রবৃত্তি তখন আমার আদৌ ছিল না, কাতরভাবে তার হাত দু'টী ধরিয়া বলিলাম—"আজ মাপ কর ভাই, আর একদিন ব'লব।"

চার

ভাইযাগ'এর সহরের পিছন দিকে সমুদ্রের জল খানিকটা ঢুকে এসেছে, এইখান্‌টাকে সকলে বলে 'ব্যাক্ ওয়াটার'। সেদিন আমি ও অরুণ নৌকাযোগে 'ব্যাক্ওয়াটার' পার হয়ে 'ডল্‌ফিন্স" নোস্' এ এলাম; এটা একটা পাহাড় খুব বড় না হলেও একান্ত ছোট নয়।

খানিকক্ষণ বেড়াবার পর দেখি একটা বড় পাথর ঠিক সমুদ্রের জলের উপরেই একটা বেদীর মত পড়ে আছে। পাথরটাকে দেখেই অরুণ বলে উঠলো "চল ঐখানে গিয়ে বসি!"

সেইখানে বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব কর্‌তে কর্‌তে লক্ষ্য করলুম অরুণ সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কি যেন মানসিক যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত সে, তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি মুখ রক্তশূন্য মড়ার মত পাংশু, ঠোঁঠদু'টি ছাইয়ের মত সাদা, থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। আমি সভয়ে বলে উঠলাম—"কিরে অরুণ তোর কি হয়েছে? শরীর খারাপ!" সে অতি কষ্টে মৃদু হেসে বললে —"হ্যাঁ ভাই আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই!"

আমি বললাম—"তবে চল—আজ ফিরে যাই। আর একদিন আসবো এখানে।" সে বলে উঠলো—"না-না, ও কিছু নয়। একটু এই হাওয়াতে বসলেই সব সেরে যাবে।" খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিবার পর অরুণ তার কোটের

পকেট থেকে একটা খাতা বের করে আমার হাতে দিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে বললে—"বিকাশ আমায় মাফ্ কর্ ভাই! গীতা-সম্বন্ধে আমার মনের ধোঁকা মেটাবার জন্য তোর এই খাতাটা চুরি করে আমি সব পড়ে ফেলেছি! কিন্তু কেঁচোর পরিবর্ত্তে শতফণা আমায় দংশন কর্‌ছে! ওহো—"

খাতাটা দেখে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ হ'ল। চোখের সাম্‌নে একটা নিবিড় অন্ধকার দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল যেন এই অন্ধকারের ভেতর একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দাঁড়িয়ে হাসছে! এযে আমার অতি গোপন-রত্ন! দুনিয়ার কারুকেও যে আমি এ গুপ্ত রতন দেখতে দিতাম না—প্রাণান্তেও না। আমি যে একে আমার পাষাণ বক্ষে জড়িয়ে ধরে নিষ্ফল স্নেহ-উৎস দিয়ে সিক্ত করে আজীবন এর মুখপানে চেয়ে থাকতাম! আহার-নিদ্রা চলে যেতো—সুখ-শান্তি পুড়ে যেতো—ঐশ্বর্য্য আমার ছায়ার মত বিলীন হয়ে যেতো, তাও ভাল; কেবল এই স্মৃতি চেয়ে থাকতো আমার পানে—আর, আমিও চেয়ে থাকতাম তার পানে, যতদিন না মরণ এসে আমার চোখের পাতাকে বুজিয়ে দিতো। কৈশোরের ভালবাসা—যৌবনের উন্মত্ততা আর স্মৃতির দহন-জ্বালা, সবই যে এতে লিপিবদ্ধ আছে; এযে আমার ডায়েরী! তা'হ'লে তো অরুণ সব জানতে পেরেছে! মলিনা আমার কে তাও তো সে জেনেছে। কি হ'ল! মলিনার কি হবে!

খাতাটাকে দুইহাতে চেপে ধরে অরুণের মুখের পানে চেয়ে

দেখি ম্লান সজল আঁখি দুটী তার পলকহীন দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছে। তার দুটো হাত আমার কাঁধের উপর রেখে রোদন-জড়িত স্বরে সে বললে—"বিকাশ—ভগবান কি আমাদের দুটীকেই জগতে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সব দুঃখের বোঝা মাথায় করে নিতে। সে বোঝার ভারের নির্ম্মম যাতনায় তুই বড় ক্লান্ত। তাই কি তিনি সেই মহাতীর্থের পথে আমাকে তোর সঙ্গী করে দিলেন! বিকাশ—ভাই, মানুষ নিজে কষ্ট না পেলে সে অপরের কষ্ট কখনও বুঝতে পারে না। আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি যে কতখানি কষ্টের অসহ্য জ্বালা তুই বুকের ভেতর চেপে ধরে আমাদের সঙ্গে এতদিন আপনার মত মেলামেশা করেছিস! আমার চেয়েও তোর জ্বালা বেশী! বিকাশ তুই আমার ভাই! একই দুঃখকে আমরা দুজনে বরণ করে নিয়েছি! আয় যদি কাঁদতে হয়, আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাঁদবো—যদি জ্বলতে হয়, আমরা দুজনে একসঙ্গে জ্বল্‌বো—যদি মরতে হয় আমরা দুজনে একসঙ্গে মরবো। তোকে আমি আর কখনও ছাড়তে পারবো না!"

ঝরঝরিয়ে তার চোখ হতে জল গড়িয়ে পড়লো। খানিক পরে আস্তে আস্তে সে বল্‌লে—"বিকাশ আমি এখন কি কর্‌বো?' আমি বললাম—"তুই আমি কি করতে পারি! ওই যে মহাসিন্ধুর উপরে মহাশক্তি রয়েছেন তাঁর উপর সব ভার দে। যেমন আছে ঠিক তেমনিই থাক্‌বে!"

রোদনজড়িতস্বরে সে বললে—"সে কি আর হয় রে! কিন্তু ভাবছি কি ক'রবো!"

হু হু করে অরুণের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কান্নার জলে তার স্বর মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে একটু সাম্‌লে নিয়ে বলতে লাগলো—"বিকাশ বিলাত থেকে দেশে ফিরে এসে যখন সিমলায় যাই তখন একদিন মলিনার বাপের সঙ্গে আলাপ হলো। ভারী সুন্দর লোক! এমনভাবে অপরিচিতকে আপনার করে নিতে পারে যে কারো সাধ্য নাই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে। তখন বুঝিনি যে ওই স্নেহময় বুকের ভেতর এত গরল ছিল। তখন ও বুঝি নাই যে মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ এতটা মিথ্যা কথা 'প্রতারণা' এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে! একদিন আমাকে বললে যে মলিনা বিধবা! বয়স যখন তার দশ সেই সময় তার স্বামী মারা যায়। এতটুকু মেয়ে,—যে 'বিয়ে' কাকে বলে জানে না—'স্বামী' কাকে বলে জানে না মৃত্যু তার কপালে কিসের আঁচড় কেটে দিয়ে গেল যে কিছুই জানে না, তাকে কেবল একটা নীচ ধাপ্পাবাজ সমাজের বন্ধনে রেখে—জীবনের সব আশা —সব সুখ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে একটা ভীষণ পাপ হবে! সেইজন্য তিনি তার বিয়ে দেবেন! সমাজকে তিনি শেখাবেন কেমন করে স্নেহ দিয়ে শ্রদ্ধা নিতে হয় সুতরাং আমাকে যদি তিনি বিবাহ করতে বলেন আমি তা হ'লে বিবাহ করতে আমি প্রস্তুত কিনা!

'আমাদের এটা' সাহেবী রীতিই বল আর যাই কিছু বল—কেহই আমরা তোমাদের এই ঠুন্‌কো সমাজের শাসন

মেনে চলি না। যদিও আমরা হিন্দু, ওই অনাচারের জন্যই সকলের কাছে আমরা 'ম্লেচ্ছ' বলে পরিচিত। বাবাকে এই বিষয় লিখতে বলে দিলাম। পরে বললাম, যে আমার বিয়ে করতে মোটেই অমত নেই। বাবাও মত দিলেন—আর বিয়েও হয়ে গেল! তুই যে লকেটের কথা লিখেছিস ওই লকেটের কত সুখ্যাতি আমি করেছিলাম। তখনও জানতাম না যে সেটা খোলা যায়! কিন্তু বিকাশ আমি কি করেছি—কি করেছি!" এই বলে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

খানিক বাদে পাগলের মত সে দূর আকাশ-পানে চেয়ে রইল; তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো "বিকাশ আমার ভেতর যেন কেমন হচ্ছে! সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। ঐ—ঐ চেয়ে দেখ কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! শুন্‌তে পাচ্ছিস্, একটা বিরাট আর্ত্তনাদের স্বর ভেসে আসছে। কোত্থেকে আসছে বল দেখি!" তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো "বিকাশ—আমি মর্‌বো—মর্‌বো! তোর মলিনাকে তুই দেখিস্; মীনাটাকে পারিস্ তো দেখিস্—তা' না হলে ওটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। ওঃ কি হ'লরে বিকাশ কি হ'ল!" এই বলে সে দাঁড়িয়ে উঠল।

সজোরে অরুণের হাত ধরে বসিয়ে দিলাম। কোনও আপত্তি সে করলে না; দর দর করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো সে বললে "ওসব শুনতে চাই না, তোকে নিতে হবে। কিন্তু—" আর সে বলতে পারলে না। হুহু করে অশ্রু অবিরল ধারায় তাহার গণ্ডস্থলে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করিল! আমার কাঁধের উপরে

হাত রেখে একেবারে মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে সে কাঁদতে লাগলো। আবার সে বল্লে "কিন্তু সেটা কি করে হয় বিকাশ? মলিনা—মীনা, দুজনে যে আমার দুটী আঁখি-তারা—তা'রা যে আমার প্রাণের মাঝে দু'ধারে দুইটী প্রদীপ-শিখা! তা'রা চলে গেলে আমি যে আজ অন্ধ!" আবার সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে আমারও চোখে জল এলো। কতদিন বাদে সেদিন আমি আবার প্রাণভরে কাঁদতে লাগলাম। আমার কাঁধের ওপর দুহাত সজোরে চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে অরুণ বললে "বিকাশ একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দে ভাই—আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না! কি হ'ল রে—বিকাশ কি হ'ল!"

একটু চুপ করে উন্মাদের মত তীব্র চাহনিতে দূরে কি দেখতে লাগলো। সেই দিকেই চেয়ে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে—"পেয়েছি দেখতে পেয়েছি—বিকাশ আমি কি দেখছি জানিস্? চেয়ে দেখ—ওই ওখানে একটা পান্‌সী দেখতে পাচ্ছিস্! ওই যে রে—এক ধারে তুই—আর একধারে আমি বসে আছি! ঝড়ের ঝাপটে কি ভয়ঙ্কর তুফান উঠেছে দেখ! ঐ অন্ধকার হয়ে আসছে—ঐ বৃষ্টি আসছে—আর ঐ পানসীর নীচে দেখ, জলজন্তুগুলো আমাদের পানে কি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! ঐ দেখ শয়তানের অট্টহাসিতে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ছে! ক্রুদ্ধ ফণীর রুদ্ধশ্বাসের মত সারি সারি ওই উন্মত্ত ঢেউগুলো ধ্বংসের গতিতে ছুটে আসছে! কই এখনও তো পানসী ডুবলো না! দেরী করিস্ নি আয় দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ি মরণের ওই করাল

গ্রাসে!" এই বলে সত্যই সে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো! সজোরে তার হাত চেপে ধরে বললাম—"অরুণ—কি কর্‌ছিস্‌?"

চীৎকার করে সে বলে উঠলো—"মরবো—আমি মরবো বিকাশ! দে—আমাকে ছেড়ে দে!" ধীরভাবে বললাম "এ সব ছেলেমানুষী নয়! ভেবে দেখ দেখি তোর ওপর কতগুলা জীবন নির্ভর কর্‌ছে। মলিনা তো আমাকে চেনে না; সে জানে তুই তার স্বামী—তুই তার সব। তুই মরলে তা'র কি হবে ভেবেছিস্‌? মীনার কি হবে ভেবেছিস্‌? তুই মরলে এরা যে সব ভেসে যাবে! কে দেখবে এদের?" কাঁদতে কাঁদতে সে বললে "তবে কি হবে? বললাম "কি আবার হবে? যেমন আছে তেমনিই থাকবে। সন্ধ্যে হয়ে গেল চল আবার বোট্‌ পাওয়া যাবে না!"

পাঁচ

বাড়ীর কাছাকাছি যখন এসেছি সন্ধ্যা তখন প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। সারা রাস্তাটা অরুণ পাগলের মত আবোল-তাবোল বক্‌তে বক্‌তে—কতবার থমকে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছে—কতবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নিজের কপালে করাঘাত করেছে!

অরুণের বাড়ীতে ঢুকেই দেখি মীনা বসে বসে খেলা করছে আর মলিনা টেবিলের উপর কতগুলো জিনিষ সাজিয়ে রাখছিল। অরুণকে দেখেই মীনা 'বাবা এসেছে—বাবা এসেছে' বলেই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবেগ ভরে মীনাকে অরুণ সজোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল!

মলিনা অরুণকে বললে "তোমাদের আক্কেলকে বলিহারি! সেই দুপুরবেলা বেরিয়ে এই রাত্তিরে বাড়ী ফেরা হ'ল!"

পরে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে "দুটী বন্ধু যেন একেবারে মাণিক জোড়! কোথায় গেছ্‌লেন?"

হেসে বললাম "Dolphin's nose এ!" কপট অবাক দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে সে বললে—"বেশ, আপনারা যে যাবেন আমাকে তো বল্‌তে হয়! আমি গেলে বুঝি আপনাদের যাওয়া হ'ত না?"

হেসে বললাম "কেন যাওয়া হ'ত না! আপনি গেলে

দিনটা তো আরও আমোদে কাটতো। বেশত একদিন সকলে মিলে চলুন না যাই!"

মলিনা হেসে বললে "আহা! থাক্! আপনাদের আর অত কষ্ট করতে হবে না! 'আমি আপনাদের আগেই দেখে এসেছি!"

এই সময় বেহারা চা নিয়ে এলো। সকলে মিলে চা খাওয়া হ'ল; এই সময়টা সকলেই কথাবার্ত্তা কইতে লাগলাম কিন্তু অরুণের মুখের সেই সরল হাসি আজ বিরল।"

হোটেলে ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল; খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না। কেমন একটা অস্থিরতা এলো। সারারাতের মধ্যে একবারও ঘুমোতে পারি নাই। কতবার চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করেছি অমনি চোখ জ্বালা করে অশ্রুতে মুখমণ্ডল প্লাবিত হয়ে পড়েছে! একটা বিরাট হাহাকার—একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কেবলই বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠেছে!

সেদিনের ঘটনার পর প্রায় চার পাঁচ দিন অরুণের বাড়ীর দিকেও যাই নাই; কেবলই তাদের কাছ হ'তে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

একদিন শুনলাম অরুণ আমাকে ডাকতে এসেছিল; কেন তা কেউ জানে না। ভাবলাম এতদিন যাই নাই তাই হয়তো আমাকে দেখতে এসেছিল। সেইদিনই মাঝরাত্রে একটা স্বর শুনলাম 'বেহারা! বেহারা!' দুই তিনবার 'ডাকবার পর দরজা খুলে গেল খানিক বাদে আমার ঘরের দরজায় করাঘাত শুনলাম। লাফিয়ে

উঠে দরজা খুলে দিতে বেহারা একখানি চিঠি দিলে। খুলে দেখি, অরুণ লিখছে—

"বিকাশ, মীনার ভারী অসুখ। পত্রপাঠ এখানে চলে আসবে। আমি নিতান্তই একলা—

অরুণ।"

মুহূর্ত্ত দেরী আর সইছিল না। শ্লিপিং সুটের উপরেই ওভার কোট্‌টা জড়িয়ে ডাক্তারী সরঞ্জাম কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি হয়েছে, সে কিছুই বল্‌তে পারলে না। বাড়ীতে এসে দেখি মা-বাপ্ দু'জনে দু'ধারে বসে অনিমেষ নয়নে মীনার পানে চেয়ে আছে। আমাকে দেখেই অরুণ সাগ্রহে আমাকে বিছানার কাছে টেনে আনলে। মলিনার মুখে যেন আশার দীপ্তি একটু ফুটে উঠলো। আলুথালু বেশ সংযত করে নিয়ে আমাকে বললে "বিকাশবাবু—আমার মীনাকে বাঁচিয়ে দিন! কি হবে। এ যে কথা কইতে পারছে না—কিছু খেতেও পারছে না!

বললাম—"কি হয়েছে যে আপনি এত অস্থির হচ্ছেন? কিছুই ভয় নেই। কাল সকালেই দেখবেন সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে!"

পরীক্ষা করে দেখলাম মীনার ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছে; গলায় বেশ স্পষ্ট 'প্যাচ'ও দেখা যাচ্ছে। মনে মনে একটু ভয় হ'ল। কথাতেই আছে যে ডাক্তার নিজের বাড়ীর কাহারও অসুখ ভাল করতে পারে না! এরা আমার কেউ নয়—তবু এরা যে আমার কত আপনার এ কথা কে বুঝবে? কে বুঝবে যে এরাই এখন আমার সব।

ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিলাম; সারারাত মীনার শিয়রে বসে একবার মলিনার কাতর আশঙ্কাপূর্ণ মুখের পানে চাই—একবার অরুণের নিশ্চল বজ্রাহত মুখের পানে চাই, অমনি ভয়ে শিউরে উঠি। যদি মীনা না বাঁচে তা'হ'লে কি হবে। কেমন করে আমি সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দেবো—কেমন করে সরলপ্রাণ স্নেহ-অন্ধ পিতা অরুণকে শান্ত ক'রবো? নিজের অগোচরে কতবার মলিনা আমার হাত তার মুঠার মধ্যে চেপে ধরে বলেছে "মীনা ভাল হবে তো? বিকাশ বাবু, ডাক্তারবাবু! সত্যি বল্‌ছেন তো কিছু ভয় নেই?" শান্তভাবে উত্তর দিয়েছি "ভয় কিসের? এখনি ভাল হয়ে উঠবে।" অরুণ আমার সঙ্গে আর কথা কহে নাই। চেয়ারের উপর স্তব্ধভাবে বসে চেয়েছিল সে মীনার রোগক্লিষ্ট মুখের পানে। ভিতরে তার কোনও চেতনা ছিল বোধ হয় না—সব যেন অসাড় —বিকল!

নিঝুম রাত; কোথাও কোনও শব্দ নেই; কেবল বাহিরে সাগরের গর্জ্জন ও ভিতরে ঘড়ির টিক্‌ টিক শব্দ। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে আকাশের কালো ওড়্‌না ফুঁড়ে ফিকে গোলাপী রঙের রঙীন্‌ আলো বালুচরের উপর ছড়িয়ে পড়লো। আকাশ--সাগরের সন্ধিস্থলে ইরাণরাণীর চোখের কাজলের মত কালো কালো মেঘগুলো তখনও নিদ্রাসায়রে নিমজ্জিত ছিল।

পাখীরা তখনও প্রভাতী গান গায় নাই, ঊষা যে এসেছে অনেকে তখনও জানে নাই; মাঠে মাঠে—বনে বনে সাগরের কূলে কূলে তখনও সে আবাহন-গীতি আরম্ভ হয় নাই। ঠিক

এমনি সময় খুব ক্ষীণস্বরে এক করুণ বেহাগের সুর হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ভেসে এলো! মনে হ'ল এ ঠিক বাঁশীর সুর নয়; এ নিশ্চয়ই আমার মত কোন এক ছন্নছাড়ার জীবনের হাহাকারের আকুল আর্ত্তনাদ! নিশ্চয়ই আমারই মত কেঁউ এই বাঁশী বাজাচ্ছে; কেননা ব্যথা না পেলে ব্যথিতকে কেউ যে বোঝে না! হঠাৎ গাছে গাছে—পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে সাড়া পড়ে গেল 'উষ: এসেছে'! পাখীরা কল গান করে উঠলো— নবপ্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে মাতাল হাওয়া হেসে কুটী কুটী হ'ল। উপরে নীলাভ শুভ্র মেঘ— শিশুগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কে এসেছে! নীচে পাগল সাগর আনন্দে নেচে উঠলো! সারা জগত যেন কিসের একটা হিল্লোলে সজাগ হয়ে উঠলো।

ঠিক এমনি সময়ে মীনা চোখ খুলে আমার পানে চাহিল। পরে অবাক হয়ে ডাকিল "কাকাবাবু!" এক হাতে আমার একটি হাত ও অপর হাতে মলিনার একটি হাত ধরে তা'র মা'কে বললে "কাকা এসেছে?" মলিনা মীনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে "মীনু মা আমার—কেমন আছিস?" মীনা তখন আমার ও মলিনার হাত খুব নিবিষ্টচিত্তে দেখছিল; একবার আমার হাত মলিনার উপর রেখে পরে মলিনার হাত আমার উপর রেখে বলতে লাগল কেন আমার হাতে চুড়ী নাই, মলিনার হাতে আছে! আমার হাত ফর্সা না মলিনার হাত ফর্সা? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। লজ্জায় সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মনে হ'ল হাতটা সরিয়ে নিই—কিন্তু কেন যে পারলাম না জানি না।

খানিক বাদে পিছন ফিরে দেখি চেয়ারের উপর বসেই অরুণ ঘুমিয়ে পড়েছে। মলিনা অরুণকে তুলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি বললাম "ওকে আর এখন জাগাবেন না। প্রায় সারারাতই বেচারা জেগেছিল, একটু ঘুমাতে দিন।"

মলিনা আবার মিনার কাছে বসতে আসছে দেখে বলে উঠলাম—"আপনি স্নানটান করে একটু জিরিয়ে আসুন। আমি ততক্ষণ মীনার কাছে বসে আছি। আপনি তো সারারাতটাই জেগেছিলেন!"

মলিনা মৃদু হেসে বললে "আর আপনি বুঝি রাত জাগেন নাই যে আপনাকে আর বিশ্রাম করতে হবে না!"

আমি বললাম "আমাদের রাত জাগা সওয়া আছে কিন্তু আপনার তো নেই। সেইজন্যেই বলছি কষ্টটা আপনারই হয়েছে। যান্ আর দেরী করবেন না! আপনি এলে তবে আমি বাড়ী যাব।" মলিনা হেসে বললে "এই আমাকে বিশ্রাম করতে বল্‌ছেন আবার তাড়াতাড়িও আসতে বল্‌ছেন! কি করে হয় বলুন তো?"

বললাম "এ রকমে না বললে আপনাকে ঘর হতে কি করে বের করি বলুন?"

সে বললে "তা হয় না! আপনি বরং আগে মুখ হাত ধুয়ে আসুন তারপর আমি যাচ্ছি।"

একটু গম্ভীর হয়ে বললাম—"আপনি যদি না যান তা'হ'লে আমাকে এখনই বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যেতে হবে।"

"বাপ্‌রে বাপ্! বিলাত ফেরত হলে কি মেজাজটাও বিলাতী হয়ে যায়!" হেসে এইবলে সে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

একদিকে অরুণ অন্যদিকে মীনা দুজনেই ঘুমচ্ছে মাঝে স্তব্ধ ভাবে বসেছিলাম আমি, নির্ব্বাক্‌—নিশ্চল! কত কথাই না মনে এল। কোথায় বসে আছি আমি? কার কাছে আমি স্নেহের দ্বার খুলে দিয়েছি? এ স্নেহ কই কেহতো চাহে নাই; এ যে অযাচিত অপ্রত্যাশিত! কেন কিসের জোরে এরা আমার জিনিষের উপর দাবী রাখতে চায়? কই এরা তো চায় নাই? তবে কি আমার স্নেহের উৎস স্বেচ্ছায় এদের পায়ের তলায় লুটায়ে পড়েছে?

প্রায় মিনিট দশেক পরে দেখি মলিনা স্নান সেরে এক কাপ্‌ চা ও খানকতক বিস্কুট একটী প্লেটের উপর রেখে নিয়ে আসছে।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম "এর মধ্যে সব হয়ে গেল? কখনই বা স্নান করলেন আর কখনই বা এ সব তৈয়ার করলেন?"

সে হেসে বললে "আপনারাই বুঝি সব কাজ তাড়াতাড়ী সেরে নিতে পারেন? মেয়েরা বুঝি আর পারে না?"

কোনও কথা না বলে মুখ ধুয়ে এসে চা খেতে বসলাম। এমন সময় অরুণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে "মীনা কেমন আছে বিকাশ?"

আমি বললাম "বেশ ভালই আছে! এই এতক্ষণতো কথা কইছিল! তুই ঘুমোচ্ছিলি বলে আমি ডাকি নাই।" অরুণ আর কিছু না বলে চেয়ারে আবার বসে পড়লো।

বিষের ঝড়

দিন কয়েক পরে মীনা সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর একদিন অরুণকে না বলে ওয়ালটেয়ার ছেড়ে চলে গেলাম। ট্রেণে ওঠবার সময় একটী চিঠিতে লিখে দিলাম যে কোনও বিশেষ কারণে আমি তাড়াতাড়ী চলে যাচ্ছি সেইজন্য দেখা করতে পারলাম না। কিছু যেন সে মনে না করে!

বাড়ীতে এসেও অরুণকে আর কোনও চিঠি দিই নাই। কেমন আছে, কোথায় আছে আর কোনও খবরও লই নাই। বাকী আর রইলো কি! সব তো শেষ হয়ে গেল! স্থির করলাম, আর প্রাণান্তেও ওদের সংস্পর্শে যাব না। এই আমাদের শেষ!

ছয়

অদৃষ্টের অন্তরাল থেকে নিয়তি কেবলই হাসছে! ক্রূর সে হাসি কুটিল অবজ্ঞায় ভরা! কোন বাধা সে জানে না—কোনও শাসন সে মানে না। একটা বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত এখানে সেখানে সে ঘুরে বেড়াচ্চে। মানুষ যেতে চায় এক পথে কিন্তু নিয়তি তাকে নিয়ে যায় অন্য পথে!

অরুণদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে প্রায় বছর খানেক কাটিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম এইবার বুঝি নিজেকে নূতন করে গড়তে পারবো। কিন্তু হায়রে হায়! মানুষ তুই যে বড় দুর্ব্বল! সাধ্য কি যে তুই এতটুকও জিনিষ নিজের ইচ্ছায় করতে পারিস?

সেদিন একখানা চিঠি পেলাম; খুলে দেখি যোগেশবাবু মস্ত বড় এক চিঠি লিখেছেন। দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম! সেই যোগেশ বাবু? আবার সেই সব পুরানো কথা? সেই গীতা—সেই মলিনা, আবার? চিঠি খানা পড়ে প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারি নাই। রাগে ধিক্কারে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এও কি কখনও সম্ভব? মলিনাকে মীনাকে রেখে অরুণ সত্যই এই ছয় মাস নিরুদ্দেশ? উত্তেজনার তাড়নায় কতবার যে ঘরের ভেতর পায়চারী করেছি—কতবার যে কত জিনিষ এধারে ওধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তা কিছুই মনে নাই। অরুণ কি করলি! কি করলি! শেষে যোগেশবাবু লিখেছেন মলিনার ভারী অসুখ;

আমি যেন পত্রপাঠ অরুণকে সঙ্গে লয়ে যাই। তিনি মনে করে-ছিলেন অরুণ বুঝি আমার কাছে আছে!

মলিনার অসুখ, আর আমি যাব না! একি কখনও হ'তে পারে? সে আমারই ছিল--এখনও সে আমারই—না না! আমি তার কেউ নই কিন্তু তবু, তবুও আমি বেঁচে থাকতে তার এত কষ্ট—এত নির্য্যাতন কেন? কে আছ, বলতে পার এর জন্য দায়ী কে?

সেই দিনই রওনা হলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি যোগেশবাবু ও গীতা দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ী তখনও আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরমের ভেতর চলছিল। যোগেশবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে গাড়ীর সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে বললেন "বিকাশ অরুণ এসেছে তো? দেখি সে হতভাগাটাকে একবার?"

হায়রে পুত্রস্নেহ! প্রস্তুত হও বৃদ্ধ; তুমি তো জান না কত খানি ব্যথা আজ তুমি পাবে! কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে একলা দেখে বৃদ্ধ আর্ত্তস্বরে বলে উঠলো "ডাক্তার সত্যিই কি তবে অরুণ আসেনি? সেকি তা'হ'লে তোমার কাছে যায়নি?" কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না। নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ বললে "ডাক্তার সত্যিই কি তুমি জান না অরুণ কোথায় আছে?"

ধীরে ধীরে বললাম "আমি কিছুই জানি না। তার কোনও খবরই আমি পাইনি।"

পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে কেঁদে বলে উঠলো "ডাক্তার আর আমি আমার মা'কে বাঁচাতে পারলাম না! এই অরুণের আশাতেই বুঝি সে এতদিন বেঁচে ছিল কিন্তু এইবার যখন শুনবে যে অরুণ আসে নাই আর সে বাঁচবে না।"

সকলে গাড়ীতে উঠলাম। গীতার দিকে চেয়ে দেখি তার মলিন চোখ দুটী আমার পানে চেয়ে আছে! চোঁখাচোখি হ'তেই লজ্জায় সে চাহনি অন্যদিকে সরে গেল। গীতার সঙ্গে একটা কথা বলারও অবসর হয় নাই। কেবল মলিনা কেমন আছে এই চিন্তাই মনের ভেতর তোলপাড় করতে লাগলো।

মলিনাকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে সে বাঁচবে বলে আমার একবারও আশা হ'ল না। কি বিশ্রী তার চেহারা হয়ে গেছে! সমস্ত দেহখানি একেবারে পাতলা হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে! সেই সদাহাস্যস্ফুরিত মুখখানি গাঢ় বিষাদ কালিমায় ভরা! চক্ষু কোটরাগত—চাহনি শীর্ণ ম্লান। বাঁশীর মত সে স্বর পাখীর ক্ষীণ শব্দে পরিণত।

আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো—"বিকাশবাবু এসেছেন। উনি কোথায়?"

সহজ ভাবে বললাম—"অরুণ আমার কাছে ছিল। একটা বড় চাকুরী সে পেয়েছে; আপনারা পাছে না যেতে দেন সেই ভয়ে সে না জানিয়ে চলে গেছে। সেদিন সে আমাকে একটা টেলিগ্রাম করেছে যে সে মাস খানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরবে।"

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় আছেন?" বল-

লাম—"সে তো একটা দেশে নেই! নানা দেশ সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেইজন্যই যখন যেখানে যায় সেখান হতেই তার একটা খবর পাই।" মলিনা পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। মনে হ'ল কতকটা প্রকৃতিস্থ সে হয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু রোজই অবস্থা তার খারাপের দিকে যেতে লাগ্‌লো। বড় বড় অনেক ডাক্তারও এসেছিলেন কিন্তু কেহই কিছু করতে পারলেন না। মৃত্যুর লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মলিনার জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উন্মাদের মত আছড়ে পড়ে হয়তো আমার এই আকুল প্রাণ বড় কাতর কান্না কেঁদেছিল—জীবনের প্রথম ভিক্ষা স্বরূপ হয়তো ঈশ্বরের কাছ থেকে সে তার মলিনার প্রাণভিক্ষা করেছিল! ঈশ্বরও বোধ হয় ভিক্ষা দিয়েছিলেন! তাই কিছুদিন পরে একদিন দেখি মরণের পথ হতে মলিনা ফিরে আসছে!

সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে গিয়ে দেখি মলিনা শুয়ে আছে একলা, ঘরে আর কেহ নাই। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে এক রাশ জ্যোৎস্না এসে তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্লান নিষ্প্রভ চোখ দু'টী তার আকাশ পানে চেয়ে আছে যেন কোন এক অচিন্ পথিকের আশায়! ঐ চোখ দু'টী আগে অত নিষ্প্রভ ছিল না কিন্তু বহুকাল ধরে ঐ অচিন্ পথিকের পথ চেয়ে চেয়ে যেন অমন নিস্তেজ হয়ে গেছে। মুখ তার পাংশু বর্ণ গোধূলির মত ম্লান! তবুও তখন সে মুখের সৌন্দর্য্য এতটুকু নষ্ট হয় নাই!

আমি কাছে যেতেই মলিনা পাশ ফিরিল। জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন আছেন?"

সে বল্‌লে—"আজ ভাল নেই; বিকাল থেকে আমার কেমন একটা ভয় হচ্ছে!"

বল্‌লাম—"কি হচ্ছে—বলুন তো?"

প্রথমে সে কোনও উত্তর দিল না; পরে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে—"বিকাশবাবু, আমি আর বাঁচবো না!" তার চোখ বেয়ে মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মৃদু হেসে বল্‌লাম "আপনি তো ভাল হ'য়ে এসেছেন! কেন তবে এমন কর্‌ছেন?"

অবজ্ঞার হাসি হেসে সে বল্‌লে—"না—আমি আর বাঁচবো না!"

খানিকবাদে আবার বললে "আমার দিকে একদৃষ্টে কি চেয়ে দেখছেন? ভাবছেন বুঝি আমি বাঁচবো? না—আর আমাকে বাঁচাতে পারবেন না! আচ্ছা, আমি মরবার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। আপনাকে দিব্যি করতে হবে যে, আপনি একটাও মিথ্যা কথা বলবেন না!" কেমন একটা ভয় এলো; এরূপ কথা তো কখন মলিনার মুখে শুনি নাই!

আস্তে আস্তে মলিনার শয্যাপার্শ্বেই দাঁড়ালাম। সে বললে "এই বিছানার উপরেই বসুন।"

সঙ্কোচ যেন আমাকে সরাইয়া দিল। বিছানায় না বসে চেয়ারে বসলাম।

এই দেখে সে হেসে বললে "ভয় নেই; এই বিছানায় বসলে আপনাকে কোনও অসুখ বোধ হয় স্পর্শ করত না! আপনি না ডাক্তার?"

সজোরে কে যেন আমাকে চাবুক মারিল; তাড়াতাড়ি চেয়ার

ছেড়ে বিছানার উপরেই বসে পড়লাম। তারপর সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা—আপনি আমাদের কে? কেউ তো নন; তবে কেন আমাদের এত যত্ন করেন—আমাদের জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন!"

বললাম—"এ সব কথা বলে কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন? ভাইয়ের বাড়ীতে থাকতে কারুর কি কষ্ট হয়?"

একটুখানি নিশ্বাস টানিয়া লইয়া একেবারে মলিনা বলিয়া ফেলিল—"আপনার কি বিয়ে হয়েছিল?"

বললাম—"হ্যাঁ—হয়েছিল।"

সে বললে—"তিনি কি বেঁচে আছেন?"

চুপ করে রইলাম; কোনও জবাবও দিতে পারলাম না আবার সে বলে উঠলো—"কই বলুন।"

মিনতি করে বললাম—"আপনি এ সব কথা কেন জানতে চাইছেন? আমাকে ক্ষমা করুন; আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না!"

সে উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা তার নামটী কি?"

বললাম—"না—তাও বলতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করুন।"

স্তব্ধভাবে সে শুয়ে রইলো। খানিক বাদে বলিল—"ঐ ড্রয়ারের ভেতর একটা কাগজের বাক্স আছে; এনে দেবেন?"

ধীরে ধীরে বাক্সটী এনে তা'র হাতে দিলাম। সে একটা কাগজ বের করে বললে—"এটা কি আপনার লেখা?"

কাগজটা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেখানা আমারই ডায়েরীর একখানা পাতা। তা'তে লেখা ছিল—"আজিকার এই শাস্তি সব চেয়ে কঠোর—সবচেয়ে জ্বালাময়! ওগো—এযে আমারই মলিনা—এযে আমারই বক্ষে সযত্নে রক্ষিত চির-আদরের চির-স্নেহের মূর্ত্তি—যাকে আমি আজীবন পূজা করেছি, বক্ষের এই রক্তচন্দন দিয়ে; এযে আমার সেই মানস-প্রতিমা—যার ছোট্ট দু'টী পা আমি আমার অফুরন্ত অশ্রুজলে এতদিন ধুয়েছি। ওই মুখ—ওই হাসি—ওই চাহ্‌নি আমি কি কখনও ভুলতে পারি! ওযে আমার প্রাণ—আমার আলো—আমার সাধনা! ওযে আমার মলিনা—কেবল যে আমারই।"

*　*　*　*　*　*

কাগজখানা মুঠার মধ্যে চেপে ধরে বললাম—"হ্যাঁ—এটা আমারই লেখা! আপনি এ কাগজ কোত্থেকে পেলেন?"

আস্তে আস্তে সে বললে "ওয়ালটেয়ারের বাড়াতে টেবিলের নীচে এই কাগজটা কুড়িয়ে পাই। পরে উনি বলেন, বোধ হয় এটা আপনারই কাগজ!—আচ্ছা এ মলিনা কোথায় আছেন, তা জানেন না?"

কোনও উত্তর দিতে পারি নাই; মনে হ'ল যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! একদৃষ্টে মলিনার পানে চেয়েছিলাম। উত্তেজনায় চোখমুখ হতে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগ্‌লো।

খানিকবাদে সে বলে উঠলো—"হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে! আর একটা কাজ দয়া করে করবেন?"

বললাম—“কি বলুন ?”

সে বল্লে—“ঐ ড্রয়ারেই একটা ছোট কাঠের কৌটা আছে, এনে দেবেন ?”

কৌটাটি আনিয়া তার হাতে তখনই দিলাম ; সেও তৎক্ষণাৎ উহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—“এটা উনি আপনাকে দিতে বলেছিলেন ! কিন্তু আমার জিনিষ আপনাকে কেন দিতে বললেন তা জানি না !”

খুলে দেখি সেই লকেট্ ! আমার সেই ফটো ! এমন কি সেই কাগজের টুকরাটীও রয়েছে ! কত বছরের সেই লুপ্ত কাহিনী অগ্নিশিখার মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ! ধৈর্য্যের সব বাঁধ ভেঙ্গে গেল ! দুর্ব্বলতা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে !

মলিনার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললাম—“এখনও কিছু বুঝতে পারনি ! লকেটের ভিতরে কি আছে দেখেছ কি ?” এই বলে লকেটটী খুলে ফেললাম ; পরে আবার বললাম—“ভাল করে দেখতো এই ছবিটা কার ? আমার সঙ্গে কোন মিল আছে কি ?” আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে একবার ছবিটার পানে—একবার আমার পানে চেয়ে—আবার ছবিটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। তারপর চক্ষু মুদিত করে আর্ত্তস্বরে বললে—“এবার সব বুঝেছি !” মুদিত চক্ষুর কোণ হ’তে মুক্তার মত অশ্রুধারা নেমে এলো। তার শীর্ণ ঠোঁটটী দাঁত দিয়ে চেপে ধরা সত্ত্বেও থর্‌থর্ ক’রে কাঁপতে লাগলো। তা’র হাত দু’টী চেপে ধরে অশ্রুজড়িত স্বরে বললাম—“মলিনা—মলিনা !”

সে যখন আমার পানে চাহিল, তার রক্ত আঁখি দুটী অশ্রু-বন্যায় ভাস্‌ছিল!

অনেক দিন বাদে হারানো স্নেহের নিধি ফিরে পেলে মানুষ যেমন পাগল হয়, কেমন করে তার যোগ্য আদর করবে বুঝতে পারে না—যত আদর করে তাহাই যেন যোগ্য হচ্ছে মনে হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে মলিনা তার শীর্ণ কম্পিত হাত দুটী একবার আমার মাথার উপরে—একবার মুখের উপরে—একবার বুকের উপরে অন্ধের মত বুলাতে লাগ্‌লো! আশা যেন কিছুতেই মিটে না! দু'জনের চোখের জল মিশে তার মুখ, চোখ, গলা বুক—সব ভাসিয়ে দিতে লাগলো!

খানিকবাদে সে বলে উঠলো—"তুমি কই—তুমি কইগো?"

আতঙ্কে বললাম—"এই যে আমি, তোমার পাশেই বসে আছি! কি বলছো মলিনা!"

ধীরে ধীরে সে বল্‌লে—"তুমি যেন এখন চলে যেয়ো না, একটু বোস!"

আর্তস্বরে বললাম—"আর যাব না—তুমি ভাল হয়ে ওঠ!" ক্ষীণস্বরে তার ঠোঁঠ দুটী কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে—"না না, তা কি কখনও হয়? আমি যে—"আর সে বলিতে পারিল না; চোখের জলে তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তার মুদিত চোখের পাতাদুটী অশ্রু-বন্যার বেগ আর সহিতে পারিল না। হু হু করে চোখের জল মুখ বেয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। শীর্ণ কম্পিত বাহু দুটী দিয়ে তখনও সে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল! ইচ্ছা

যেন আমাকে সে আর ছাড়বে না; কিন্তু লোক-নিন্দা—সমাজ-শাসন তাকে টেনে হিঁচ্ড়ে যেন আমার কাছ হতে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে—তাই তার এই ব্যাকুল-বিকম্পিত আবেগভরা আকিঞ্চন!

এই ক'বছরের যে আর্ত্তনাদ বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠ্ছিল হঠাৎ সে বিদ্রোহী হয়ে আমার অন্তরের সব চেয়ে দূর্ব্বল স্থানে সজোরে ধাক্কা দিয়ে উঠলো! ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর সে অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাবার পর মলিনার পানে চেয়ে দেখি, নিতান্ত অসহায়ার মত—সদ্য বিধবার ব্যাকুলকরা দৃষ্টির মত—পথহারা শিশুর কাতর চাহনির মত আমার পানে সে চেয়ে আছে! দুই হাত দিয়ে তার মুখখানি আমার গালের উপর চেপে ধরে বালকের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। আমি কাঁদি—সেও কাঁদে! কখনও আমি চাই তার পানে—কখনও সে চায় আমার পানে—কখনও দু'জনার চক্ষু মুছাই দু'জনে!

* * * * * *

মলিনাকে ছেড়ে আবার পালিয়ে এসেছি! কিন্তু একি হ'ল! মনে যে আর শান্তি নেই—হৃদয়ে যে আর আশা নেই—দেহে যে আর শক্তি নেই! আলো এখন ভয়ে আমার কাছে আসে না। যে ধারে চাই, কোথাও আর আলো নাই—বাতাস নাই—হাসি নাই! অন্ধকারের বুক চিরে একটা হাহাকার রুদ্ধশ্বাসে কেবল ছুটে বেড়াচ্ছে! মানুষের স্বর শুনে চম্‌কে যাই—

ছায়া দেখে শিউরে উঠি! তাই কখনও কখনও দূরাগত মানুষের স্বর শুনে মনে হয়—

"অতি পরিচিত স্বরে
কেহ ডাকে সমাদরে"—

আবার কখনও কখনও মানুষের ছায়া দেখে মনে হয়—

"কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়"

লোকের কাছে যেতে আমার ভয় হয়। কেননা গেলেই তারা আমাকে খোঁচা দেবে—'মাতাল'—'মাতাল' বলে ডাকবে। তাই বিড়ালের মত সর্ব্বক্ষণই নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিয়ে একলা বসে থাকি। এক এক সময় জাগ্রত চিন্তায় ভাবি—আবার যদি,

"একদিন—কোন দিন—যদি কোন কালে
চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ অন্তরালে
বলিব না কোনও কথা; দুটি করে ধরি,
চেয়ে চেয়ে মুখ-পানে রব বুকে মরি'।"

কিন্তু আর সে কি আমার কাছে আসবে? আর কখনও কি সে আমার হবে? এই যে ভীষণ অপরাধ আমি করেছি—কে এর বিচার করবে? সে তো আর আমার নয়! আমিই যে অপরাধী—তাইতো এত মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদি। এক একবার ভাবি প্রাণটাকে বের করে ফেলে দিই। দেশাচার আমি জানি না—

বিষের ঝড়

লোকনিন্দা আমি শুনি না—সমাজ-তন্ত্র আমি মানি না! আমার চোখের অশ্রু সব জমাট বেঁধে গেছে। এখন হাসতে যাই হাসতে পারি না—ভাবতে যাই ভাবতে পারি না—কাঁদতে যাই কাঁদতে পারি না—তাই আমি মাতাল!